মুক্তির আহ্বান

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী

ডি, এম, লাইব্রেরী,
৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

হে দেব,—যে ফুল তুমি ফুটায়েছ মোর প্রাণে,
সেই ফুল অর্ঘ্য দিনু তোমারি ও শ্রীচরণে।

থাঁটুয়া,
২৪ পরগণা
১৩।৮।২৬

"প্রভা"

লেখিকার অন্যান্য পুস্তক—

দানের মর্য্যাদা—	২৲
বিজিতা—	২॥০
হৃদয়ের চাঁদ—	২৲
সংসার পথের যাত্রী—	২॥০
নতুন যুগ—	১॥০
বিসর্জ্জন—	১॥০
আমার কথা—	১॥০
জাগরণ—	১৲

মুক্তির আহ্বান

(১)

বৃষ্টিটা তখন একটু নরম পড়িয়া আসিয়াছে মাত্র; সকাল হইতে আজ সেই যে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একটিবার মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়ে নাই। সাবিত্রী গৃহের কাজ সবই সারিয়া লইয়াছে, বাহিরের কাজ এখনও একখানাও হয় নাই। উঠানের একধারে কতকগুলি বাসন, পোড়া কড়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলা এই বৃষ্টির জন্য এখনও মাজা হয় নাই। উঠানের ও-ধারে ছোট চালাখানায় গরু দুইটা বন্ধনাবস্থায় এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, গোয়াল পরিষ্কার হয় নাই। সাবিত্রী শয়ন গৃহের বারাণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে; গরু দুইটা মুক্ত হইবার আশায় ছটফট করিতেছে, সাবিত্রীর পানে চাহিয়া চীৎকার করিতেছে, বৃষ্টি একটু না থামিলে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়াও সম্ভবপর নহে। আজ ঘুম হইতে উঠিয়া বাসি ঘর পরিষ্কার করিতে করিতেই বৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে। সে বৃষ্টিধারা অগ্রাহ্য করিয়াও সে বাহিরের কাজ সারিয়া লইতে যাইতেছিল, শ্বাশুড়ীর নিষেধে উঠানে নামিতে পায় নাই।

আকাশ এখনও নিকষ কালো মেঘে ঢাকা; এখনও সেই কালো মেঘের বুকে সোণালীরেখার বিকাশ করিয়া পৃথিবীর বুকে আলোর

ঝিলিক দিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছিল ; তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় গুম গুম করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল, ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি-ধারা নামিয়া আসিতেছিল।

গৃহমধ্যে দরজার পাশে গায় একখানা কাঁথা জড়াইয়া বসিয়া নারায়ণী বাহিরের অবিশ্রান্ত ঝর ঝর বারিধারার পানে তাকাইয়া ছিলেন। বাব দিন পরে আজ সবেমাত্র তাঁহার জ্বরটা ছাড়িয়াছে, তাই উঠিতে পারিয়াছেন। এই জলে ভিজিতে পুত্রবধূকে তিনি মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়াছেন, সাবিত্রী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই।

বৃষ্টির বেগ একটু নবম পড়িবামাত্র সে শ্বাশুড়ীর পানে তাকাইল, বলিল, "এইবার যাই মা, বৃষ্টি বেশ ধরে এসেছে।"

নারায়ণী আপনমনে কি ভাবিতেছিলেন। বাহিরের বৃষ্টিধারার পানে তাঁহার চোখ ছিল বটে, মন কোথায় ছিল কে জানে, সেই জন্যই বধূর কথার সুরটা কাণে আসিতেই হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিবিষ্টমনে বৃষ্টির পানে তাকাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "কোথায় বৃষ্টি ধরেছে বউ মা ? আর একটু বসো, এখনি ধরে যাবে এখন। এই বৃষ্টিতে গেলেই যে গা-মাথা সব ভিজে যাবে, একবাব জ্বর হলে এই ম্যালেরিয়ার দেশে আর কি উঠতে পারবে মা ? মাসের মধ্যে কুড়ি পঁচিশ দিন আমার মত করেই বিছানায় পড়ে থাকতে হবে যে !"

সাবিত্রী মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, "না মা, একটু জলে ভিজলে বিশেষ কিছুই হবে না। ওদিককার সব কাজকর্ম্ম পড়ে রয়েছে, বেলাও যথেষ্ট হয়ে উঠল, ঠাকুরপো আবার এখনি ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে—"

বিকৃতমুখে নারায়ণী বলিলেন, "আ আমার ইস্কুল, মাসের মধ্যে কয়টা

দিনই যে যাচ্ছে বউমা, সেটা কিছু হিসেব রাখ? আর আজ এই বৃষ্টিতে ইস্কুলে যাবেই বা কি করে;—না আছে একটা ছাতি, না আছে কিছু। আজকের দিনটা বাড়ীতেই থাক, ইস্কুলে গিয়ে আর কাজ নেই। ওর জন্যে তোমার কিছু তাড়াতাড়ি করতে হবে না বউ মা; তুমি আর খানিকটে দেখ—বৃষ্টি ধরে কি না; তার পরে যা হয় হবে এখন।”

সাবিত্রী প্রতিবাদ না করিয়া সে কথা মানিয়া গেল; খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “কিন্তু মা, গরু দুটো ভারি ছটফট করছে, বড্ড ডাকছে—ওদের দুধ দু'য়ে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারলে হতো। কচি বাছুর দুটো—”

“আর একটু থাক বউ মা, এই বৃষ্টিতে ওরাই বা যাবে কোথায়? দেখো তুমি, ছেড়ে দিলেও ও'রা কোথাও নড়বে না, ঠিক ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তবে হ্যাঁ—কচি বাছুর দুটো বড্ড ছটফট করছে বটে, —তা থাক আর একটু, তার পরে বৃষ্টির ভাবটা দেখে যেয়ো এখনি।”

বধূ আর কথা বলিতে পারিল না, নিরুত্তমভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল; বারাণ্ডার একধারে পোষা কুকুরের দুইটি ছানা লইয়া দেবর যতীন খেলা করিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। এদিকে এই প্রবল বৃষ্টি, মা বউদির কথাবার্ত্তা, সেদিকে এই দুর্দ্দান্ত বালকটির মোটেই দৃষ্টি ছিল না, সে কুকুর লইয়াই তখন উন্মত্ত ছিল। ছানা দুইটি বিধিমতে নির্য্যাতন করিয়া, লেজ ধরিয়া কাণ মলিয়া কাঁদাইয়া তাহার তৃপ্তি হইল না, অবশেষে তাহাদের মাকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল।

কুকুরটা বিরক্তিস্চক অনেক আপত্তি জানাইল, দুই একবার খেউ খেউ করিয়া কামড়াইতেও গেল, কিন্তু বীর বালক তাহাতে ভয় পাইল না; সে কুকুরটির কান দুইটা দুই হাতে ধরিয়া এমন নিদারুণ মোচড় দিতে লাগিল যে, সে বেচারা কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত শিশু ছানা দুইটিও চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল।

"ছিঃ, ছিঃ, ওকি হচ্ছে ঠাকুর পো, ওদের ও-রকম করে মারছ কেন, ছেড়ে দাও। বেচারীরা কি অপরাধ করেছে তোমার কাছে বল তো, যার জন্যে তুমি অমন করে ওদের মারছ?"

পিছনে বউদির কথা শুনিয়াই যতীন তাড়াতাড়ি হাত দুখানা সরাইয়া লইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, বউদি তাহার পানেই তাকাইয়া আছেন। আস্তে আস্তে উঠিয়া পিছন দিকে দুই এক পা সরিতে সরিতে হঠাৎ একে-বারে ছুটিয়া সে গৃহমধ্যে পলাইল। সাবিত্রী আঘাত প্রাপ্ত কুকুরটির কাছে বসিয়া পরমস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল, ছানা দুইটিকে ধরিয়া তাহার বুকের কাছে দিল।

একটু বাদেই যতীন ফিরিয়া আসিল। একটু আগেই যে যতীন কুকুর কয়টির উপর অত্যাচার করিতেছিল, এ যেন সে যতীন নয়; এখন দিব্য নিরীহ ভাব, যেন সে এতক্ষণ এখানে ছিল না, এইমাত্র বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই রকম গম্ভীর ভাবে সে বলিল, ভাত দাও বউদি, ইস্কুলের বেলা অনেক হয়ে গেছে।"

ছানা দুইটি কেমন করিয়া স্তন্য পান করে নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই দেখিতে দেখিতে সাবিত্রী বলিল, "ভাত এখনও হয় নি ঠাকুরপো

ভাই। আজ আর এই বৃষ্টিতে ইস্কুলে যেতে হবে না, বাড়ী থাক। দেখো এখন আজকের এ বৃষ্টিতে অনেক ছেলেই ইস্কুলে যাবে না, তুমিও না হয় একটা দিন নাই গেলে।”

বউদির কথায় তীব্রতা মোটেই ছিল না, অধিকন্তু কুণ্ঠিত ভাবটা ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া যতীন যো পাইল, নিজের জিদ বজায় রাখিতে সে চীৎকার করিয়া বলিল, “না, সে কথা বললে কিছুতেই হচ্ছে না বউদি, আমার এক্ষুণি ভাত চাই-ই। বাঃ রে,—ইস্কুলে যেতে হবেনা—বেশ কথাই বলেছ। আজ আমাদের ইস্কুলে ইনেস্পেক্টার সাহেব আসবে; কাল পণ্ডিত মশাই বার বার করে বলে দিয়েছেন, যেন সকাল সকাল ইস্কুলে যাওয়া হয়,—আর তুমি বলছো কিনা ভাত হয়নি, ইস্কুলে যেতে হবে না—বেশ কথা।”

“কিরে যতীন, কি হয়েছে, কি বলছিস বউমাকে ?”

কাঁথাখানা মুড়ি দিয়া কখন যে নারায়ণী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহা যতীন জানিতেও পারে নাই। মায়ের প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গলার সুর সপ্তমে চড়াইয়া সে উত্তর করিল “আজ আমাদের ইস্কুলে ইনেস্পেক্টার সাহেব আসবেন, পণ্ডিত মশাই তাই বার বার করে বলে দিয়েছেন, দশটার সময় ভাল কাপড় জামা পরে যেন ঠিক গিয়ে হাজির হওয়া চাই, নইলে আর ইস্কুলে ঢুকতে দেবেন না। আমি বেশ বুঝতে পারছি দশটা কখন বেজে গেছে, সকাল হয়েছে কি আজকের কথা ? বউদিকে কাল হতে বলে রেখেছি, বউদি এখন বলছে ইস্কুলে যাস নে—”

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে সানুনাসিক সুরে কাঁদিয়া উঠিল,—

"সে আর অন্য কেউ নয়, সে নিজে ইনেস্পেক্টার সাহেব। পণ্ডিত মশাই বলেছেন, তিনি নাকি সাহেবদের মত পোষাক পরেন, যেখানে যত ইস্কুল আছে সকলের কর্তা তিনিই। আজ যদি ইস্কুলে না যাওয়া হয়, তাহলে—"

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়াই আকুল হইল।

একে রোগের জ্বালায় নারায়ণীর শরীর ও মন দুই-ই ভাল ছিল না, ইহার উপর যতীন পাঠশালায় যাইতে পারিল না শুনিয়া কাঁদায় তিনি ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, "আরে মর, তাতে কাঁদিস কেন বুড়ো ছেলে? ভারিতো তোর ইস্কুল, ও তো একটা পাঠশালা, ওর আবার দাম আছে নাকি? এই বাদলায় আজ কি তোর সেই ইস্কুল বসবে, যে তোর পাঠশালা,—একটু মেঘ করলেই ছুটি দেয়, তার ওপর আজ এই মেঘ-ডাকা আর মুষল ধারে বৃষ্টি।"

যতীন জোর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তবুও ইস্কুল বসবে। হাজার মেঘই ডাকুক আর ঝড়জলই হোক তবু আজ ইস্কুল হবেই, আজকে ইনেস্পেক্টার সাহেব আসবে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাত হলেই তুই ইস্কুলে যেতে পারবি; তোর ছাতা কোথায় রে হতভাগা?"

যতীন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মায়ের পানে তাকাইয়া রহিল; তাই তো, ছাতার কথাটা যে তাহার মোটে মনেই ছিল না।

নারায়ণী বলিলেন, "যা, ঘরে গিয়ে নিজের পড়ার বই নিয়ে বস গিয়ে। আসুক গিয়ে তোর ইনেস্পেক্টার সাহেব, না হয় তোকে ও পচা ইস্কুলে আর পড়তে নাই দেবে—"

যতীন দুই চোখ কপালে তুলিল, প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "তবে আমার আর তো পড়াই হবে না মা। সকলে যে বলে ছোটবেলায় লেখাপড়া না করিলে চিরজন্ম তাকে কেঁদে বেড়াতে হয়; তুমিও তো মা কতদিন এই কথা বলেছ। তা হ'লে আমি কি শেষে কুলির মত লোকের মোট বয়ে বেড়াব?"

মা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন,—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দেখি, তোর অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। বউ মা বলছিল জমিদারের ইস্কুলে দিতে,—যদি হয় দেখি।"

কথাটা যতীন বিশ্বাস করিতে পারিল না, না পারিবারই কথা। জমিদারের স্কুলে পড়িতে গেলে মাস মাস বেতন চাই, সে বেতনও বড় কম নহে। সে যেখানে পড়ে এটি আগে—এমন কি সাধারণের কাছে এখনও পাঠশালা নামে খ্যাত রহিয়াছে, কেবল তাহারা কয়েক জন মাত্র জোর করিয়া ইহাকে স্কুল নামে অভিহিত করে। সে পূর্ব্বে অনেকবার জমিদারের হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য কত আবদার করিয়াছে, কত কাঁদিয়াছে, কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হন নাই। তাহাদের স্কুল নামধারী পাঠশালায় চেটাই পাড়িয়া বসিতে হয়, আর তাহার সঙ্গী—এককালে যাহারা তাহার সহিতই চেটাইতে বসিত, তাহারা এখন স্কুলে বেঞ্চে বসে আর তাহার মত অভাগীদের কতই না বিদ্রুপ করে। ইহারাও একদিন পাঠশালায় পড়িত এ কথা তাহারা স্কুলের সীমানায় পা দিতে দিতেই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারা যে কোনদিন পাঠশালায় পড়িয়াছে এ কথা বলিতে এখন তাহারা লজ্জা পায়। ভদ্র সন্তানের সংখ্যা পাঠশালায় কমিতে কমিতে দুইটিতে মাত্র

আসিয়া ঠেকিয়াছে, সে দুইজনের মধ্যে একজন যতীন, অপর দাসেদের ছেলে কানাই। পাঠশালায় আর যত ছেলে পড়ে সবই তামলি, তেলি, ময়রা প্রভৃতি; তাহাদের সকলেরই অবস্থা হীন, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে তাই এখানেই পড়িতে হয়, জ্ঞান পাইয়া অবধি পূর্ব্ব সঙ্গীদের তীব্র বিদ্রূপে যতীন জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে, এখন সে এই পাঠশালা ছাড়িতে পারিলে বাঁচে।

মায়ের হাতখানা সাগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি মা, সত্যি আমায় ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে? কিন্তু তুমি যে বলতে—ইস্কুলের মাইনে দিতে পারবে না, এখন তবে কোথা হ'তে মাইনে দেবে? এই তো কালও বলছিলে, দাদার এখনও চাকরি হয় নি,—তবে—"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সে মায়ের পানে চাহিল।

পুত্রের প্রশ্নে মা যেন একটু দমিয়া পড়িলেন, আস্তে আস্তে পিছন ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "জানিনে বাপু, তোর সঙ্গে এখন আমি অত বকতে পারি নে। যা যখন হবে তা তখন দেখতেই পাবি। মোটের ওপর শুনে রাখ, আজ এই বৃষ্টিতে কক্ষণো তোর ইস্কুলে যাওয়া হবে না।"

তিনি গৃহমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

যতীন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মা যে অমন কথাটা তুলিয়া ইহারই মধ্যে চাপা দিয়া সরিয়া পড়িবেন, তাহা সে ভাবে নাই।

সাবিত্রী খুব কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, স্নেহভরে যতীনের পিঠের উপর হাতখানা রাখিয়া মিষ্ট সুরে বলিল, "সত্যি ঠাকুর পো, আমি

বলছি, যথার্থ তোমায় ইস্কুলে দেওয়া হবে। আমি অনেক টাকা এক জায়গায় পেয়েছি, আমার কাছেই সব আছে। তুমি সোমবার হতে ইস্কুলেই ভর্ত্তি হ'তে পারবে।

মায়ের কথা বরং সময় সময় মিথ্যা হইয়া যায়, বউদির কথা যে কখনও মিথ্যা হয় না, তাহা যতীন বেশ জানিত। তাহার মুখখানা বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—"যাই, কানাইকে খবরটা দিয়ে আসি—"

সে ছুটিতেছিল, সাবিত্রী বাধা দিল, "যাচ্ছো কোথায় ঠাকুর পো, বৃষ্টি পড়ছে যে।"

"বৃষ্টি ধরে এসেছে বউদি, ও সামান্য জলে আমার কিছু হবে না। দেখো তুমি বরং—গা মাথা ভিজেছে কি না—"

বলিতে বলিতে সে দৌড়াইল।

বৃষ্টি তখন প্রায় ধরিয়া আসিয়াছিল; গৃহকর্ম্ম শেষ করিতে বধূ উঠানে নামিয়া পড়িল।

---

(২)

দুইটী মাত্র পুত্র,—রবীন্দ্রনাথ ও যতীনকে লইয়া নারায়ণী যখন বিধবা হন, তখন যথাক্রমে বড় ও ছোটর বয়স দ্বাদশ ও চতুর্থ বৎসর। ক্রোড়ে ছয় মাসের একটি কন্যা ছিল, বিধবা হওয়ার কিছুদিন বাদেই সে কন্যাটি মারা গিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনাপূর্ণ দায়ীত্ব হইতে জননীকে মুক্তিদান করে।

বিধবা হইয়া প্রথমটায় নারায়ণী অকুল পাথারে পড়িয়া গেলেন, কি করিবেন তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। হরিহর মিত্র যখন মারা যান তখন তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং কিছু দেনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। পৈত্রিক পুষ্করিণী, বাগান সবই এই দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গেল, কেবল মাত্র বসত বাড়ীখানি বাঁচিয়া গেল।

হরিহর মিত্রের প্রথম পক্ষের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ এখন কলিকাতায় বেশ বড়লোক। নারায়ণী চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে যখন এ সংসারে পদার্পণ করেন, তখন বীরেন নবম বর্ষীয় বালক মাত্র। সাংসারিক জ্ঞান সে বয়সে কিছু না হইবারই কথা, কিন্তু হিতৈষী গ্রামের সকলে তাহার মনে জ্ঞান-বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই যখন অঙ্কুরিত হইল, সে তখন কিছুতেই নারায়ণীর স্নেহবন্ধনের মধ্যে ধরা দিল না। একটু বড় হইলে

সকলের কথা শুনিয়া সে বুঝিয়াছিল, পিতার স্নেহ উপভোগ করিবার অধিকারও সে হারাইয়াছে। সৎমায়ের ভালবাসা ও মুসলমানের মুরগী পোষা যে একই সমান, এ দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহারা বীরেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে সচেতন করিয়া দিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের মামা কলিকাতায় কোন অফিসে কাজ করিতেন। একদিন তুচ্ছ একটা কারণে বিমাতার সহিত ঝগড়া করিয়া তাঁহাকে যৎ-পরোনাস্তি অপমান করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় যাত্রা করিল, তাহার জেদ—যে বাড়ীতে সৎমা রহিয়াছেন, সে বাড়ীতে আর সে থাকিবে না। পিতা সজলনেত্রে কিশোর পুত্রের হাত চাপিয়া ধরিলেন, বার বার করিয়া বলিলেন, সৎমা তাহারই দাসী মাত্র; তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারায়ণীকে তিনি এখানে রাখিবেন না, পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন,—বীরেন যেন বাড়ী ছাড়িয়া না যায়। বীরেন তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাতও করিল না, সেই যে সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল আর ফিরিয়া আসিল না। পুত্রের ব্যবহারে হরিহর মিত্র বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ব্যাপারটা যদি তিনি আগাগোড়া স্বচক্ষে না দেখিতেন, স্বকর্ণে সব কথা যদি না শুনিতেন, তাহা হইলে নারায়ণীর অদৃষ্টে কি ঘটিত বলা যায় না, পুত্রগত প্রাণ পিতার বিচারে হয়তো তাঁহাকে স্বামীর আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত।

মামার বাড়ী থাকিয়া বীরেন আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িতে পাইয়াছিল। তাহার সৌভাগ্যক্রমে মামার অফিসে ঢুকিয়া সে ছোট সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছিল। তিনি তাহাকে নিজের কন্যার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পরে কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। অসাধারণ

বাকপটুতা ও কর্ম্মকুশলতা গুণে বীরেন বড় সাহেব মিঃ এণ্ডির সুচোখে পড়িয়াছিল, লোকে কানাকানি করিত—শ্বশুরের অবর্ত্তমানে বড় সাহেবের অনুগ্রহে বীরেনই শ্বশুরের পদ পাইবে।

হরিহর মিত্র যখন মারা যান তখন বিপদে আত্মহারা নারায়ণী এই পুত্রকেই পত্র দিলেন। হরিহর মিত্র বাঁচিয়া থাকিতে দুইবার তিনি কলিকাতায় গিয়া পুত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথম বার বীরেন বাড়ীতে থাকিয়াও বাড়ী নাই খবর দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়াছিল। শ্বশুরবাড়ীর লোকের কাছে এই গ্রাম্য বৃদ্ধটীকে নিজের পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে সে বড়ই লজ্জাবোধ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বার সে যখন আফিসে বাহির হইতেছিল সেই সময়েই ধরা পড়িয়া যায়। পিতা যখন সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন, সে তখন তিন পা পিছনে সরিয়া গিয়াছিল। একটুও দাঁড়াইবার সময় নাই—এখন বড় তাড়াতাড়ি—বলিতে বলিতে সে মোটরে উঠিয়া পড়ে।

এই ঘটনাটি বৃদ্ধ পিতার মনে চিরকালতরে গাঁথিয়া গিয়াছিল। পুত্র তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইল না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল না, তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। মোটরে আর একজন কে ছিলেন—তিনি বীরেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটি কে?"

বীরেন তাড়াতড়ি উত্তর দিয়াছিল, "ও আমাদের বাড়ীর পুরাণো সরকার মাত্র। ছোটবেলায় কোলে পিঠে নিয়েছে বলে স্পর্দ্ধা করে এখনও যে আমায় আশীর্ব্বাদ করতে আসে এই আশ্চর্য্য।"

কথাটা হরিহর মিত্রের কাণে আসিয়াছিল, অশ্রুভরা চোখ দুটি তুলিয়া

বারেক পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি সেই যে পিছন ফিরিলে আর কখনও সে দিকে যান নাই।

এ কথাটা তিনি পত্নীর কাছেও বলিতে পারেন নাই, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত সে কথা বুকের মধ্যে গোপন ছিল। হায়রে, এ কথা কি বলিবার? পুত্র পিতাকে ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ-পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই, এ কথা কি কাহাকেও জানাইবার? মানুষের বুকের মাঝে কত কথা না গোপন থাকে, এ কথাটাও তেমনি গোপনে থাক, জগতের আর এক প্রাণীর কানে না যায়।

তবু তো তিনি সেই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, কোন দিন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বড় ব্যথায় পড়িতে চাহিলেও তিনি তখনি তাহা সামলাইয়া লইতেন। না—না, তাহার অকল্যাণ হইবে। সে তাঁহাকে যাহাই বলুক—তাঁহার সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করুক—সে তাঁহার পুত্র, তাহার মা মৃত্যুকালে তাহাকে বড় বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্—তাহার ভাল হোক, তাহার মঙ্গল কর, সে আরও উন্নতি লাভ করুক। দশের কাছে সে প্রতিষ্ঠালাভ করুক, তাহার পিতাকে সে নাই বা দেখিল।

গোপন কথা বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াই হরিহর মিত্র অনন্তে মিশিয়া গেলেন। দেনার জ্বালায় বিব্রত হইয়া নারায়ণী দুইটি সন্তান লইয়া বিব্রত হইয়া অসহায়ের সহায় বীরেনকেই পত্র দিলেন। বীরেন যে আজকাল একটা অফিসের কর্ত্তা হইয়াছে, তাহার বেতন যত, খাতির ততোধিক—এসব খবর তিনি পাড়ার লোকের কাছেই পাইতেন। দুঃসময়ে

পাড়ার হিতৈষীরাই তাঁহাকে বীরেনের কাছে পত্র লিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

পত্রের উত্তরের আশায় নারায়ণী পথপানে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর আসিল না। দু তিনখানা পত্র লিখিয়াও উত্তর না পাইয়া নারায়ণী পাড়ার একটি যুবককে রেলভাড়া দিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল বীরেন তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন, বাপ যতদিন ছিলেন ততদিন সম্পর্ক তবুও ছিল। উনি কে, আমি উঁহাকে চিনি না।

বড় আঘাত পাইয়াই নারায়ণী নীরব হইয়া রহিলেন। বড় আঘাত পাইয়া হৃদয় পাষাণাপেক্ষা কঠিন হইয়া গিয়াছিল, আর কোনও দাগ সে হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে পারিত না।

বীরেনকে তিনি যথার্থই স্নেহ করিতেন, ভাল বাসিতেন। তিনি স্বপ্নেও কখনও ভাবিতে পারেন নাই বীরেন এইরূপ কথা বলিতে পারিবে।

তিনি আর কাহারও উপর নির্ভর করিলেন না, বাগান, পুকুর, কয়েকটা গরু, জলের দামে বিক্রয় করিয়া দিলেন, তখন নিজের বা ছেলেদের দিকে তিনি চাহেন নাই, যাহাতে দেনা মিটাইয়া স্বামীর আত্মাকে মুক্ত করিতে পারেন, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

দেনাগুলা শোধ দিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, এইবার ছেলেদের দিকে তাকাইবার সময় আসিল। তিনি এইবার ভাবিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া ছেলে দুইটীকে মানুষ করিয়া তুলিবেন, তাহাদের লেখা পড়া শিখাইবেন?

জ্যেষ্ঠপুত্র রবীন বেশ চালাক ছেলে ছিল, নিজের উপায় সে নিজেই করিয়া লইল। উত্তরপাড়ার চক্রবর্ত্তি মহাশয় কলিকাতায় পাটের আড়ত করিয়াছিলেন, সে তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া কলিকাতায় গিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

এই ছোট ছেলেটীর পাঠানুরাগ স্কুলের মাষ্টারদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহারা দয়া করিয়া তাহাকে নিজেদের মেসে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন ও স্কুলে ফ্রি করিয়া দিলেন।

পড়ায় ছেলেটি খুবই ভাল ছিল, ক্লাসে সে সকলের অগ্রণী ছিল, ম্যাট্রিকে সে স্কলারসিপ পাইয়া আই, এ, পড়িতে লাগিল।

কোন্নগরে ধনী ব্যবসায়ী শিবচরণ ঘোষের পুত্র শরৎ তাহারই সহিত এক ক্লাসে পড়িত। এই ছেলেটীর বিশেষ উদ্যোগে তাহার ভগিনী সাবিত্রীর সহিত রবীনের বিবাহ হইয়া যায়।

অবশ্য যখন বিবাহ হয় তখন রবীনের ঘরের অবস্থা বাহিরের লোকের কাছে অজ্ঞাত ছিল। গ্রামের লোক শুধু মজা দেখিবার জন্যই এ বিবাহে "ভাংচি" দেয় নাই, বরং—গোপনে যখন পাত্রী পক্ষীয় লোক খোঁজ লইতে আসিয়াছিল, তখন গ্রামবাসী জানাইয়াছিল, পাত্রের অবস্থা বেশ ভাল, তবে ইহারা পল্লীগ্রামে থাকে এই যা দোষ—রবীন ভবিষ্যতে কলিকাতায় চাকরী করিলে ইহাদের সকলকেই কলিকাতায় লইয়া রাখিবে, তাহার মনের ইচ্ছা ইহাই—এবং সে গ্রামের মধ্যে যেরূপ ভাল ছেলে তাহাতে তাহার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে দেশবাসীর এতটুকু সন্দেহ নাকি নাই।

যদিও বাড়ীটি বহুকালের পুরাতন তথাপিও কোঠা তো বটে। বাহির হইতে দেখিয়া পাত্রীপক্ষীয় ভদ্রলোকটি হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার পরেই রবীনের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহে শিবচরণ বাবু কন্যাকে আপাদ মস্তক গহনায় মুড়িয়া দিয়াছিলেন—পণ স্বরূপ হাজার টাকা এবং বরাভরণ বেশী করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মনে এইটুকু ত্রুটী জাগিয়াছিল, তাঁহার মেয়ে কালো, কে জানে শ্বশুরালয়ে কিরূপ সমাদর লাভ করিবে। তবে কালো মেয়ে যদি সঙ্গে করিয়া যথেষ্ট সোনারূপা আনিতে পারে, তাহার দোষটা কতক ঢাকিয়া যায়। মেয়ের এই ত্রুটীটুকু ঢাকিয়া দিবার জন্যই শিবদাস বাবু উপযাচক হইয়া অনেক জিনিস দিয়াছিলেন।

বিবাহের পরই আসল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল ; শরৎ ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া ভগ্নিপতির মুখের সাম্মনেই তাহাকে জুয়াচোর নামে অবিহিত করিল।

শান্তস্বরে রবীন বলিল, "ভগবান জানেন আমি জুয়াচুরি করেছি কি না। তোমরা নিজেরা দেখে শুনে তোমার বোনকে আমার হাতে দান করেছ। আমি নিতে চাই নি, তোমরা যখন উপযাচক হয়ে দিয়েছ, তখন আমায় যা তা বলা যে উচিত নয়, সেটা তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি শরৎ।"

বাস্তবিকই কথা বলার মত মুখ আর ছিল না, শরৎ রাগে ফুলিতে লাগিল; কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিল না।

সাবিত্রী নেহাৎ ছোট মেয়ে নয়, পঞ্চদশ বর্ষীয়া, তাহাকে লইয়াই যে এত গোল বাধিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সে ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া

উঠিয়াছিল। বিবাহের পর সে যখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল, তখন মা খানিকটা খুব কাঁদিলেন, পিতা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আর সেখানে মেয়ে পাঠাইব না। সমবয়স্কা মেয়েরা সব ভারি ঠাট্টা তামাসা জুড়িয়া দিল, সাবিত্রীর কাছে পিত্রালয়ে বাস যেন অসহ্য হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন শ্বশুরালয়ে যাত্রা করার সময়ে সে পিছনে যে আনন্দ সুখ ফেলিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া আর তাহা পাইল না, পাইল কেবল অশান্তি, জ্বালা।

সে কালো মেয়ে বলিয়া মা তাহাকে বরাবরই একটু অশ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। তিনি নিজে গৌরবর্ণা ছিলেন, তাঁহার অন্য ছেলে মেয়েগুলি তাঁহার বর্ণ লাভ করিয়াছিল, কোলের এই মেয়েটী যে কোথা হইতে গায়ের এই কালো বর্ণ পাইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। এই মেয়েটী পিতার বড় আদরের ছিল, মায়ের কাছে কালো হওয়ার অপরাধে যত সে লাঞ্ছনা ভোগ করিত, পিতার কাছে ততোধিক আদর লাভ করিত।

প্রথমটা খানিকটা কাঁদিয়া মা নিজ স্বভাব ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফলতা লাভ করিয়াছে, মেয়ে কালো বলিয়াই যে গরীবের ঘরে পড়িয়াছে—কর্ত্তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া ইহাই বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। বিবাহের আগে সাবিত্রী মায়ের কাছে যে পরিমাণে লাঞ্ছনা ভোগ করিত, বিবাহের পরে তাহার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল।

এই অপমান লাঞ্ছনার মাঝখানে তাহার মনে জাগিয়া উঠিত পল্লীগ্রামের সেই বাড়ীখানি, মনে পড়িত শ্বাশুড়ীর আদর-যত্নের কথা. তাহার প্রাণ সেইখানেই ছুটিয়া যাইতে চাহিত, এখানে সে থাকিতে চাহিত না।

বিবাহের পর রবীন একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, সে আর শ্বশুরালয়ের ছায়াও মাড়ায় নাই, পত্নীকেও কখনও পত্রাদি দেয় নাই। এদিকে মায়ের অবহেলা, সঙ্গিনীদের বিদ্রূপ, দাদার কষ্ট—এ সব যেমন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, ওদিকে স্বামীর অবহেলাও তেমনি তাহার বুকে বিঁধিয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় রবীন একবার মাত্র চোখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিয়াছিল, পলকের দৃষ্টিপাতে সাবিত্রী দেখিয়াছিল, রবীনের উজ্জ্বল—আনন্দভরা মুখখানার উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিল, সে আর চোখ তুলিয়া চায় নাই। ফুলশয্যার রাত্রি সে নীরবে গৃহের মেঝেয় একটা মাদুরে পড়িয়া কাটাইয়াছিল, ভোরে যখন বাহির হইয়া যায়, তখন সাবিত্রীর নিকটে দাঁড়াইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিয়াছিল, "আমায় ক্ষমা কর তুমি। প্রথমে যখন বিয়ের কথা হয়েছিল, তখন দেখেছিলুম শুধু টাকা—তোমায় দেখিনি, তারই ফলে জীবনের সহচারিণীরূপে তোমাকে পেয়ে নিজেও অসুখী হয়েছি, তোমাকেও করেছি। তবু বলছি—আমায় মাপ কোরো—আমায় দয়ার চোখে দেখো।"

সাবিত্রী জানে জগতে কেহই তাহাকে আদর করিবে না, আন্তরিক ভালবাসা পাইয়াছে সে পিতার কাছে, আর পাইয়াছে সেই দরিদ্রা নারীর কাছে।

সেই দরিদ্রের কুটীরে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে এখানে আর থাকিতে পারিতেছিল না। শ্বাশুড়ী যখন তাহাকে বৎসরান্তে একবার দশদিনের জন্য নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য বেহাইনকে পত্র দিলেন, তখন বেহাইনের ক্রোধ দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখে যাহা আসিল তিনি তাহাই বলিয়া রবীনের মাকে উদ্দেশে গালাগালি করিলেন।

মায়ের এরূপ ব্যবহার সাবিত্রীর মনে বড়ই আঘাত দিয়াছিল: ইহার পরে সম্পর্কীয় দেবর যে দিন তাহাকে লইতে আসিল, সে দিন মা যে অভদ্রোজনোচিত গালাগালি আরম্ভ করিলেন, তাহা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মায়ের কাছে গিয়া জানাইল সে শ্বশুরালয়ে যাইবে, শ্বাশুড়ী যখন তাহাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছেন তখন তাহার যাওয়া উচিত।

মা একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, কন্যা যে স্বেচ্ছায় দরিদ্রের ঘরে ঘর নিকাইতে বাসন মাজিতে চায়, এ যেন তাঁহার কাছে স্বপ্নের মত বলিয়া ঠেকিল। বিদ্রূপের সুরে তিনি বলিলেন, "সেখানে যেতে চাস, দাসীবৃত্তি কত সুখের তাহা পরীক্ষা করতে বুঝি? বাড়ীতে যার পেছনে দুটো দাসী ঘোরে—, সে—"

জেদ করিয়া সে বলিল,—"আমি দাসীবৃত্তিই করতে যাব মা। গরীবের ঘরে যখন বিয়ে হয়েছে, তখন ঘর নিকাতে বাসন মাজতে হবে বই কি? ধনীর মেয়ে—ধনীর বোন এ নামে পরিচিত হওয়ার চেয়ে, গরীবের স্ত্রী আখ্যাতে গৌরব আছে মা। তুমি আমায় আটক করে রাখতে চেষ্টা কর না, আমি সেখানে যাবই।"

মা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বেশ কথা, যাবি যা; কিন্তু মনে রাখিস সাবিত্রী,—এই যে নিজের জেদে যাচ্ছিস, তোর এখানে আসবার পথ আর রইল না—নিজের পেছনের পথ তুই নিজের হাতে মুছে দিয়ে গেলি। মনে রাখিস, সে রকম দিন আসবেই, যে দিন অন্নাভাবে তোকে পরের তুয়ারে দাসীবৃত্তি করতে যেতে হবে, সে দিনও তোর বাপের বাড়ীর পথ তোর কাছে বন্ধ থাকবে। একটা পথের ভিক্ষুণীকে ডেকে আমি তাকে আদর করে খেতে দেব, কিন্তু তুই অবাধ্য মেয়ে,—তুই যদি আমার দরজায় বসে একটু ফিরে চাইবার জন্যে কেঁদে মরিস, তবু তোর পানে তাকাব না।"

তথাপি সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সমস্ত গহনা পড়িয়া রহিল, মূল্যবান জিনিস্ পত্র পড়িয়া রহিল, একখানি কাপড় পরিয়া একখানি কাপড় হাতে লইয়া সে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় চাইল। পিতা নিঃশব্দে তাকাইয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁহার মুখে ফুটিল না।

কাপড় গহনা বিক্রয় করিয়া সে যে শ্বশুর বাড়ীর গোষ্ঠি পালন করিবে এবং এই গুলির জন্যই যে শ্বাশুড়ীর এখন বধূকে আবশ্যক পড়িয়াছে এ কথা তিনি দেবর আসিবামাত্র তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন, এই জন্যই সাবিত্রী সব ফেলিয়া গেল।

সে আজ এক বৎসরের কথা হইয়া গিয়াছে, সাবিত্রী এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে পত্রাদি দেয় নাই, সেখান হইতেও কেহ কোনও খবর দেয় নাই।

রবীন দুবার দুইদিনের জন্য বাড়ী আসিয়াছিল মাত্র, মাকে একবার দেখিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী যত দূর সম্ভব দূরে দূরেই থাকিত, ফুলশয্যার রাত্রের কথা তাহার মনে চিরতরে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

রবীন আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়া এখন চাকরীর চেষ্টায় ফিরিতেছিল, মাঝে মাঝে দুই চার মাসের মত অস্থায়ী কাজও করিতেছিল, কোনও কাজে এখনও পাকা হইয়া বসিতে পারে নাই।

যতীন ত্রয়োদশ বর্ষীয় অস্থির চঞ্চল বালক, পাঠশালায় সামান্য লেখা-পড়া শিখিত—তাও নিজের ইচ্ছামত, মন ভাল না থাকিলে পাঠশালার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকিত না।

সংসারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, দুইবেলা পরিপূর্ণ আহারও জুটিত না—যদি রবীন মাসে মাসে কিছু না পাঠাইত, তথাপি—এত কষ্টের মধ্যেও নারায়ণী বড় সুখী ছিলেন, কারণ তাঁহার পুত্রবধূর মত পুত্রবধূ খুব কম লোকেরই মেলে। বধূর মুখের পানে তাঁকাইয়া অনেক সময় তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সে নিজের মুখে তাহার এখানে আসার ইতিবৃত্ত তাঁহাকে কিছু না বলিলেও নারায়ণী সবই শুনিয়াছিলেন; দুঃখে সুখে তিনি চোখের জল ফেলিয়া সেদিন স্বর্গগত স্বামীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "ওগো কোথায় তুমি আছ, আজ একবার এসো, লক্ষ্মীরূপা বউমা নিয়ে ঘর কর।

৩

ভাত মাখিতে মাখিতে সাবিত্রী ডাকিল, "ভাত দেওয়া হয়েছে, মাখাও হয়ে গেল, এসো ঠাকুরপো, যা হয় দুটো খেয়ে নাও।"

সে যা হয় খাওয়াই বটে। মুখের স্বাদ ছেলেটীর একটুও ছিল না, যাহা পাইত খাইয়া গেলেই হইত। খাওয়ার জন্য তাহাকে লইয়া কোন দিন কোন জ্বালা পাইতে হয় নাই।

যতীন তখন নিবিষ্টমনে একটা সাজি তৈয়ারী করিতেছিল। কাল সে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া বাঁশের আগা গোটাকত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, নেহাৎ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কাল আর সেগুলি চাঁচা হয় নাই, আজ সকালে ঘণ্টাখানেক মাত্র পড়িয়া সে সাজি তৈয়ার করিতে বসিয়া গিয়াছে।

এই সাজি তৈয়ারী করার মূলে একটা জেদ ছিল। জমিদার কন্যা ইলা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, সম্প্রতি সে এখানে মাস তিনেকের জন্য পিতার সহিত বেড়াইতে আসিয়াছে। কারণ, জন্মিয়া পর্য্যন্ত সে কখনও দেশ দেখে নাই, বরাবর কলিকাতাতেই আছে।

মেয়েটী যেন মূর্ত্তিমতী আনন্দ, দুদিনেই স্কুলে গিয়া সব ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়া লইয়াছিল, গ্রামেও অনেক বাড়ী ইহারই মধ্যে তাহার ঘোরা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার দেশ হইতে বিদায়ের সময় আসিয়াছে

আর একদিন পরেই সে চলিয়া যাইবে ; তাই স্কুলের সব ছেলেরা তাহাকে যে যাহা পারিতেছে এক একটী প্রীতি উপহার দিতেছে।

ইহাদের মধ্যে মল্লিকদের ছেলে নরেন তাহাকে নিজের হাতে তৈরি একটী সাজি দিয়া যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। নূতন এই জিনিসটী পাইয়া ইলার মুখে হাসি আর ধরে না, মেয়ের আনন্দ দেখিয়া পিতাও আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং নরুকে ডাকিয়া সকলের সমক্ষেই তাহাকে খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। যাহারা ছোট বড় যে কিছু উপহার দিতে পারিয়াছিল, ইলা তাহাদের প্রত্যেকের হাত ধরিয়া পিতার কাছে লইয়া গিয়া জিনিস দেখাইয়া পরিচয় দিয়াছিল।

মাষ্টারের আদেশে ক্লাসের সব ছেলেই সেখানে ছিল, যতীনও বাদ পড়ে নাই। সে বেচারা সকলের পিছনে অতি সঙ্গোপনে নিজেকে লুকাইত রাখিয়াছিল। ইলার চক্ষু যখন তাহার উপর পড়িল, তখন সে বিস্ময়ে চিবুকে একটী আঙ্গুল দিয়া বলিল, "ওমা যতিদা, তোমার তো বেশ আক্কেল, একটী পাশে চোরের মত লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ ; সামনে এসো।

দুর্দ্দান্ত বালক যতীন—লজ্জা কাহাকে বলে তাহা সেই প্রথম জানিতে পারিল। মুখখানা লাল করিয়া ফেলিয়া চোখ দুইটী মাটীর উপর রাখিয়া সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না, আমি সামনে যাব না, আমি কিছু দিতে পারিনি।"

ইলা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তা না দিতে পেরেছ তাতে দুঃখ কি যতি দা? আমরা তো জানি তুমি গরীব, কোথা হতে কি দেবে? এসো তুমি বাবার কাছে, বাবা সব প্রাইজ দিচ্ছেন, তুমিও নাও এসে। কিছু

নাই বা দিলে, প্রাইজ তুমিই ভাল পাবে, কেননা পড়ায় তুমি সকলের চেয়ে ভালছেলে।”

সে যতীনের হাত ধরিল, কিন্তু যতীন এক পেঁচ দিয়া তাহার হাত হইতে নিজের হাত মুক্ত করিয়া লইয়া ভোঁ করিয়া দৌড় দিল, আর পিছন ফিরিয়া চাহিল না। ভাল ছেলের প্রাইজ তুলা রহিল, জমিদার বাবু তাহা হেড মাষ্টারের হাতে দিয়া ছুটি হইয়া গেলেন।

কাল দুপুরে নিঃশব্দে যতীন বইগুলা বাড়ীতে রাখিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। অন্য ছেলেরা যখন প্রাইজ লইয়া সগর্ব্বে তাহাকে দেখাইবার জন্য তাহার খোঁজে আসিয়াছিল, সে তখন নদীর ধারে বাঁশবনের মধ্যে বাঁশ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

যে নরু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, এতটুকু বয়স হইতে যে তাহার শত্রুতা করিয়া আসিতেছে; তাহার এ প্রাধান্য সহ্য হয় না। সে নরুর চেয়েও ভাল সাজি তৈয়ারী করিয়া আজ দিনটার মধ্যে ইলাকে উপহার দিবে, দেখাইবে নরুর চেয়েও সে ভাল তৈয়ারী করিতে পারে।

বউদির ডাক তাহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল না, সে যেমন আপন মনে কাজ করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল। বধূ এদিকে ডাকিতেছে, নারায়ণী বারাণ্ডায় বসিয়াছিলেন, তিনি এতবার ডাকিলেন—যতীন কাহারও কথায় কান দিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

বর্দ্ধিতরোষা নারায়ণী উঠানে নামিয়া গেলেন, তাহার পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিয়া সক্রোধে বলিলেন, “কথা কানে যাচ্ছে না হতভাগা? ইস্কুল—ইস্কুল, প্রথম ছেলের তাড়া কত, এখন এতটা দেরী হয়ে গেল—

যাবি কখন? সকল ছেলে ইস্কুলে চলে গেল আর ও কিনা এখনও বসে আমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করছে।”

হঠাৎ পিঠে চড়টা পড়ায় যতীন বড় বেশী রকমই চমকাইয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের পানে তাকাইল। মা গলার সুর দ্বিগুণ বাড়াইয়া বলিলেন, “পনের ষোল বছর বয়েস হল তোর,—আর কি ছেলেমানুষ আছিস, এখন যে নিজের ভাল বুঝবার সময় হয়েছে। পাঠশালায় পড়তিস, মাইনে কম ছিল, দুদিন না গেলেও কিছু হতো না। এখন ইস্কুলে পড়ছিস—বউমা তো নিজের হাতের বালা বিক্রি করে তোর মাইনে যোগাচ্ছে, এর পর তোর নিত্যি জরিমানার পয়সা কে যোগাবে রে হত-ভাগা? না পড়িস—না পড়বি—সেটা স্পষ্ট বলে দে, নাম কাটিয়ে দেওয়া যাক।”

যতীন এতক্ষণে হঠাৎ চড়ের ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিল, এইবার দুই হাতে চোখ ডলিতে ডলিতে কান্নামাখা সুরে বলিল, “হ্যাঁ আমি তাই বলেছি বুঝি—যে আমি ইস্কুলে যাব না। তুমি শুধু শুধু আমায় মারলে কেন—হ্যাঁ। আমি তো—”

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সাবিত্রী তখনও ভাতমাখা হাতে বসিয়াছিল, বামহাতে একখানা কাগজ লইয়া পাখা অভাবে সেইখানা দিয়া মাছি তাড়াইতেছিল।

যতীনকে কাঁদিয়া আসিতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে সে বলিল, “কি হয়েছে ঠাকুর পো, কাঁদছ কেন?”

চট করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বিকৃতকণ্ঠে যতীন বলিল, কাঁদছি কেন,—কই কাঁদছি? বড় আমার হিতৈষিণী বউদি কিনা

—তাই তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে না চীৎকার করলে হতো না—। আবার এখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে—কাঁদছ কেন ?"

তাড়াতাড়ি ভাতের থালার কাছে বসিয়া একটানে সেখানা একেবারে কোলের কাছে টানিয়া লইল, কত ভাত যে ছড়াইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই। মনের রাগের সঙ্গে হাতের কাজের নৈকট্য যে এতটা হইবে যতীন তাহা পূর্ব্বে ভাবে নাই। তাই ভাত ছড়াইয়া যাওয়ায় সে প্রথমটায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল,—কিন্তু সে মিনিটখানেক স্থায়ী হইল না।

তাহার ভাব দেখিয়া সাবিত্রীও কিছু বলিল না, হাত ধুইয়া ফেলিয়া সে দূরে একটা পিঁড়িতে বসিয়া পড়িল।

"আচ্ছা বউদি, তুমিই বল—মা যে আমায় মেরে উঠিয়ে দিলে, এটা কি ভাল কাজ হল ? ওরা কালই চলে যাবে, আজ যদি ওটা না করে দিতে পারি তা হলে—"

বোধ হয় ভাত গিলিতে গিয়া গলায় আটকাইয়া গেল, সে বিষম খাইল।

সাবিত্রী অন্যমনাভাবে কি ভাবিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কারা চলে যাবে ঠাকুর পো ?

চাপাস্বরে যতীন বলিল, "ইলারা কাল চলে যাবে যে।"

বউ দি অন্যমনস্কভাবে বলিল, "তাই নাকি ? কি দেবে তাদের তা তো বললে না ঠাকুরপো ?

যতীন বলিল, "ওই যে সাজিটা তৈরী করছিলুম, মা তৈরী করতে দিলে না।"

বিস্মিতা সাবিত্রী বলিল, "সাজি দিয়ে কি হবে ?"

যতীন তখন গত কল্যকার ঘটনা সব খুলিয়া বলিল, সকল ছেলে ছোট বড় কত জিনিস ইলাকে দিয়াছে, কিন্তু সে এমন যে একটা ছোট কিছু, তাও দিতে পারে নাই। এইজন্যই সে ভাবিয়াছিল, সাজিটী তৈয়ারী করিয়া ইলাকে দিয়া আসিবে।

সমবয়স্ক প্রায় দেবরটীর ব্যথা সাবিত্রী বেশ অনুভব করিল, সে বলিল, "আচ্ছা ভাই ঠাকুরপো, তুমি স্কুলে যাও, আমি তোমার সাজি তৈরী করে রেখে দেব, তুমি বাড়ী এসেই পাবে।"

বিস্ময়ে যতীন তাহার পানে তাকাইয়া অবিশ্বাসের সুরে বলিল, "হ্যাঁ, তুমি করবে বই কি?"

সাবিত্রী বলিল, "সত্যি করে দেব, মিথ্যে কথা বলব কেন, তুমি এসে দেখো আমি করে রেখেছি কি না।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া যতীনের মনে বিশ্বাস হইল সে সত্যই বলিতেছে, তথাপি সে বলিল, "কিন্তু যদি খারাপ হয়ে যায়—"

সাবিত্রী একটু হাসিল, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে তুমি দেখে নিয়ো ভাই, যদি খারাপ হয় তখন বলো। আমরা ছোট বেলায় কি সুন্দর সাজি তৈরী করতুম, সে রকম তুমি কিছুতেই তৈরী করতে পারবে না। একবার এমন সুন্দর হয়েছিল যে, মা পর্য্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন।"

পুরাতন কথাটা মনে উঠিতেই অনেক কথা জাগিয়া উঠিল, সাবিত্রী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

যতীন হাসিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ, তুমি যে রকম করে কথা বললে বউদি —যেন মার কাছে হতে প্রশংসা পাওয়া মস্ত বড় গর্ব্বের কথা।"

সচকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সাবিত্রী অপ্রস্তুতের মত হাসিল, বলিল, "না, তাই কি কথা। মার কাছে—"

সে কথায় বাধা দিয়া সোৎসুকে যতীন বলিল, "যাই হোক—আমি এসে যেন সাজি পাই বউদি, ঠিক হবে তো?"

"হবে হবে, তুমি ওঠ তো এখন, বেলা অনেক হয়েছে।"

তাড়াতাড়ি করিয়া যতীন উঠিয়া পড়িল, সাজির কথাটা বার বার করিয়া মনে করাইয়া দিয়া সে বই লইয়া বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণীকে আহার করাইয়া নিজেও আহার শেষ করিয়া লইয়া সাবিত্রী সাজি তৈয়ারী করিতে বসিল।

চৈত্রের দারুণ রৌদ্রে চারিদিক ঝলসিয়া যাইতেছে, গরম বাতাস বহিতেছে। নারায়ণী গৃহমধ্য হইতে বলিলেন "ওকি হচ্ছে বউ মা? এই ঠিক দুপুরে বাইরে বসে থেক না মা, ঘরে এসো।"

সাবিত্রী অনুনয়ের সুরে বলিল, একটু পরে যাচ্ছি মা, এই সাজিটা শাঁ করে সেরে দেই, ঠাকুর পো এসেই নেবে বলে গেছে।"

অসন্তুষ্টা নারায়ণী বলিলেন, "ওর মাথা বাছা তুমিই আরও খেলে। যা যখনি ধরবে, যেমন করেই হোক তোমার দেওয়া চাই, এমনি করে ও একেবারে আদুরে গোপাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমায় যত বলি ওর কোন আবদার শুনো না, ও ছেলে কোনদিন আকাশের চাঁদ ধরে দিতে বলবে, —তা তুমি বাছা কথা শোনো না!"

কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে কি ইহাতে নারায়ণী খুব খুসীই ছিলেন। ইহারা দুইটীতে সারাদিন ঝগড়া করিত আবার নিজেরাই মীমাংসা করিয়া

ফেলিত। যতীনের যত সব খেয়াল মিটাইতে সাবিত্রী ছাড়া আর কেহ পারিত না।

সাবিত্রীও যে তাহা না জানিত তা নয়। শাশুড়ী তাঁহার মনের সন্তুষ্টি ভাব বাক্যে প্রকাশ না করিলেও তাঁহার মুখের ভাবে মনের কথা ফুটিয়া উঠিত। আজও সে তাই নীরবে নিজের কাজই করিয়া যাইতে লাগিল, গৃহমধ্যে বকিতে বকিতে নারায়ণী কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টা দুয়ের পরিশ্রমে সাজিটী অতি সুন্দর ভাবে শেষ হইয়া গেল; সেটা হাতে তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্যমনস্কভাবে দেখিতে দেখিতে সাবিত্রী ভাবিতেছিল—তাহার পিত্রালয়ের কথা।

কত দিন আগে সে এখানে আসিয়াছে, তাঁহাদের একটা সংবাদও এ পর্য্যন্ত পায় নাই। সে জোর করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এই তাহার অপরাধ, এ অপরাধ পিতামাতা ভ্রাতা কেহই ক্ষমা করিতে পারিলেন না?

অভিমানে তরুণীর চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল—ভাল, তাহাই হোক, তাঁহারা মনে করুন—সাবিত্রী মরিয়া গিয়াছে, সাবিত্রীও তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে থাকিবে; তাঁহাদের নামে নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহাদের লজ্জা দিবে না।

তাহার পরই মনে পড়িল স্বামীর কথা।

হায়রে কালো, কালো বুঝি জগতের বুকে আসিয়াছে শুধু ঘৃণা কুড়াইতে। কালোর বুকের মধ্যেও যে প্রকৃত মানুষটা জাগিয়া আছে তাহা দেখিবে কে? লোকে মনে করে কালোর উপরটাও যেমন ভিতরটাও তেমনি। নিজের জননী যখন কালো ও গৌরের পার্থক্য রাখিয়া চলিয়াছেন, তখন পরে কেন না রাখিবে?

তথাপিও মন বুঝে না বলিয়াই সে রবীনকে একখানি পত্র অনেকদিন আগে দিয়াছিল, তাহার যে উত্তর রবীন দিয়াছিল, তাহা কালোর প্রতি তীব্র বিদ্রুপই বটে। সে পত্রখানার উপর সাবিত্রী একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া লইয়াছিল, তাহার পর আর পড়িতে তাহার সাহস হয় নাই, সে পত্রখানা তালপাকানো অবস্থায় তাহার বাক্সের কোন এক কোণে পড়িয়া আছে।

রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের এক প্রান্ত বহিয়া একখানি মেঘ ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহার বর্ণ কালো হইলেও উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে শুভ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই মেঘখানার পানে তাকাইয়া সাবিত্রী ভাবিতেছিল—তাহার এ পৃথিবীতে জন্মানোই ঝকমারি হইয়াছে। এখনও কি এই অভিশপ্ত জন্মের শেষ করিয়া দেওয়া যায় না?

হঠাৎ সে চমকাইয়া উঠিল,—ছি, সে ভাবিতেছে কি? সে তো পড়িয়াছে—আত্মহত্যার চিন্তা করাও পাপ, তবে সে সেই কথাই ভাবিতেছে, ভগবান, রক্ষা কর তাহাকে, এ অপবিত্র চিন্তা তাহার মন হইতে দূর করিয়া দাও।

স্কুলের ছুটি হইতেই যতীন দ্রুত বাড়ীতে পৌছিল।

সাজিটা তাহার হাতে দিয়া সাবিত্রী বলিল, "কি রকম হয়েছে ঠাকুর পো, পছন্দ হয়েছে তো?"

আনন্দে যতীন বলিয়া উঠিল, "খুব ভাল হয়েছে বউ দি, আমি কখখনো এমন সুন্দর করতে পারতুম না, তুমি বলে তাই পেরেছ। আমি এটা এক্ষুণি দিয়ে আসছি বউদি, তুমি ততক্ষণ আমার খাবারটা দাও।"

খাবার অর্থে জল দেওয়া ভাত।

সাবিত্রী বলিল, "সে আর দিতে কতক্ষণ লাগবে ঠাকুরপো, আগে খেয়ে নাও —তার পরে যেয়ো।"

যতীনের তখন বিলম্ব সহিতেছিল না, সাজিটী ইলার হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে সে যেন শান্তি পায়, তাই অনুনয়ের সুরে বলিল, "এই তো খুব কাছেই বউদি, আমি চট করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি।"

সাজিটা লইয়া সন্তর্পণে সে বাহির হইয়া গেল।

---

(৪)

দীর্ঘ এক বৎসর পরে রবীন বাড়ী আসিতেছে শুনিয়া মায়ের বুকে আনন্দ ধরিতেছিল না, তিনি প্রথমেই সম্মুখে সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়াই আগে সুখবরটা দিয়া ফেলিলেন, "জানলে বউমা, রবি বাড়ী আসছে খবর দিয়ে পাঠিয়েছে। আজ একটু পাড়ায় গিয়েছিলুম, সুধীনদের বাড়ী যেতে সে বললে—কাকিমা, রবির চিঠি পেয়েছেন? কি করে বলি মা—যে সে আমায় ছয়মাস অন্তর একখানা দুটি লাইন চিঠি লিখে পাঠায়—সেই মাতৃভক্ত সন্তানের আমার আজকাল এমনই ভাব হয়েছে? আমি তবু সত্যিকে চাপা দিতে মিথ্যের প্রশ্রয় দিলুম, বললুম হ্যাঁ প্রায়ই পত্র দেয়। সে বললে, রবি এই সামনের ছুটিতে এখানে আসবে।

সাবিত্রীর মুখখানা এ সংবাদে যে কি রকম বিবর্ণ হইয়া উঠিল, আনন্দে অধীরা মাতা তাহা দেখিতে পাইলেন না। যতীনকে দাদা আসার খবর দিতেই সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল; কিন্তু মায়ের কাছে বেশী আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না, রান্নাঘরে ছুটিয়া গেল—"বউদি, শুনেছ—আমার দাদা আসছে।"

এত বড় ছেলে হইলেও বউদির সঙ্গে দাদার যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই, কোন দিন জানিতেও চায় নাই। দাদা বিবাহ করিয়া বউদিকে আনিয়াছেন এইটুকুই সে জানে, ইহার বেশী জানিবার আবশ্যক তাহার কোনদিন হয় নাই। বউদি তাহার একারই

সে তাহাই জানিত, সেই জন্য বউদির উপর তাহার নির্য্যাতনও চলিত, ঝগড়াও চলিত।

সে ভাবিতেছিল তাহার যেমন আনন্দ হইতেছে বউদিরও তেমনি হইবে, কিন্তু বউদি কোন উত্তরই দিল না, নির্ব্বাকে অন্যমনস্কভাবে জ্বলন্ত উনানের পানে তাকাইয়া রহিল। আগুনের আভায় তাহার মুখখানা লাল দেখাইতেছিল, সেই লালের মধ্যে কতকটা যে স্বাভাবিকতা ছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বউদিকে নীরব থাকিতে দেখিয়া যতীন অধীর হইয়া বলিল, "শুনছো বউদি ?"

সচকিতভাবে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া সাবিত্রী বলিল, "কি বলছো ঠাকুরপো ?"

"বা বাঃ, বউদি যেন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, এতগুলো কথা যে বলছি তা যেন শুনতেই পায় নি—,"

বলিতে বলিতে যতীন হাসিয়া উঠিল।

একটু লজ্জিত হইয়া সাবিত্রী বলিল, "না, কথাটা কানে এসেছে বটে কিন্তু কি যে বলছো তা—"

যতীন বলিল, "বুঝতে পারনি, না ? দাদা আসছে যে, মা বললেন সুধীন দা নাকি মাকে বলেছে। আচ্ছা বউদি, দাদা এবার এক বছর পরে আসছে, আন্দাজ কর দেখি, আমার জন্যে কি আনছে ?"

সাবিত্রীর তখন বেশী কথা বলার ইচ্ছা ছিল না, বাধ্য হইয়া তাহাকে উত্তর দিতে হইল, অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কি করে বলব ভাই,—যদি বলতে পারতুম, তা হলে তো জ্যোতিষীই হয়ে যেতুম।"

যতীন বলিল, "আহা আমি তো তোমায় গুণে ঠিক করে বলতে বলছিনে, আন্দাজ করতে বলছি। বল না একটা আন্দাজ করে, দেখি কতদূর হয়। একটু ভেবে বল না।"

সাবিত্রী না ভাবিয়াই ফস করিয়া বলিল," জুতো জামা কাপড়—"

বাধা দিয়া হাততালি দিয়া যতীন হাসিয়া উঠিল, "না, তোমার কথা ঠিক হল না বউদি, কাপড় জামা জুতো এর মধ্যে কোনটাই নয়। ঠিক করে বল দেখি, কেমন বলতে পার।"

সাবিত্রী নিরুপায়ভাবে বলিল, "তবে বলতে পারলুম না।"

মাথা দুলাইয়া যতীন বলিল, "হ্যাঁ, তাই স্বীকার কর তুমি বলতে পারবে না। আমি ঠিক বলব বউদি, দাদা আমার জন্যে একটা ফুটবল আনবে।"

সাবিত্রী নিভন্তপ্রায় উনানে কাঠ দিতে দিতে বলিল, "তা হবে।"

যতীন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা হবে কি, দেখে নিয়ো—এ যদি সত্যি না হয় তো কি বলেছি। আমি দাদাকে সেবার বলে দিয়েছিলুম, দাদা এবার নিশ্চয়ই আনবে।"

এক বৎসরের কথা যে দাদার ঠিক মনে নাও থাকিতে পারে, এ কথা তাহার মনে না জাগিলেও সাবিত্রীর মনে চকিতে একবার জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে, সে কথা প্রকাশ করিল না, উদাসভাবে বলিল, "হতে পারে।"

যতীন এবার স্পষ্টই রাগিল, বলিল, "হতে পারে কি? তুমি যেন কি রকম বউদি, ভাল করে কথা বলতে জান না, কেমন যেন চেপে কথা বল। দাদা ফুটবল আনবে না, তাই বুঝি তুমি মনে কর। তুমি তোমার বালা বাঁধা দিয়ে টাকা এনে আমায় ইস্কুলে দিয়েছিলে, দাদা শুনেই

পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়ে দিলে, মা তখন তোমার বালা ছাড়িয়ে নিয়ে এল। দাদা কত ভাল লোক—কিন্তু বউদি, তুমি দাদার একটু প্রশংসা করতে পার না। দাদার নাম শুনলে তুমি কি রকম যেন হয়ে যাও।”

সাবিত্রী যেন অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল, সত্যই কি তাহার মনের ভাব মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠে? যতীন পর্য্যন্ত যখন ইহা লক্ষ্য করিয়াছে, তখন শ্বাশুড়ী কি লক্ষ্য করেন নাই!

যতীন আপন মনেই বলিতেছিল, “ফুটবলটা এলে নরুদের একবার দেখাব। ওরা মনে ভাবে বড়লোক বলে ওরাই শুধু ফুটবল কিনতে পারে, আমরা পারিনে। দাদা ফুটবল নিয়ে এলে খেলে দেখাব—না বউদি? আচ্ছা বউদি, তুমি কেন খেলবে না তা বল? বাঃ বাঃ, মেয়ে মানুষ হলে তার বুঝি কিছুই করতে নেই,—সবই বিশ্রী। বেশ, লোকের সামনে না হয় নাই খেলবে, তুমি আমি আর মেধা আমাদের পেছনের বাগানে বল খেলব, কেউ দেখতে পাবে না, কি বল বউদি? যাই, মেধাকে এ খবরটা দিয়ে আসি আর সুধীনদার কাছে জেনে আসি, দাদা কবে আসবে বলেছে।”

আনন্দে অধীর যতীন তখনই ছুটিয়া বাহির হইল।

মেধা ফুটফুটে ছোট মেয়েটী, বছর এগার বয়স হইবে। জাতিতে তাহারা বেণে, অবস্থা গ্রামের মধ্যে বেশ উন্নত। মেধার পিতা অতুল বড়াল কলিকাতায় থাকেন, মাঝে মাঝে দেশে আসেন; স্ত্রী, কন্যা, শিশু দুইটী পুত্র দেশেই থাকে।

এই মেয়েটী ছিল যতীনের খেলার সঙ্গী। বউদির উপর যতটা নির্য্যাতন চলিত তাহার বেশী চলিত এই ছোট মেয়েটীর উপরে। বউদিকে

সে গালাগালি দিত, মুখ ভেঙ্গাইত, মায়ের ভয়ে গায়ে হাত দিতে পারে নাই, এ মেয়েটী মাঝে মাঝে মারও খাইত। যতীনের গালাগালি প্রহার সে নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া যাইত, বাড়ীতে কেহই তাহা জানিতে পারিত না। যতীনের অনেক খেয়াল মিটাইত এই মেয়েটী, চাহিয়া হোক—চুরি করিয়া হোক—বাড়ীতে যাহা পাইত আনিয়া যতীনকে দিত। যতীনও তাহা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিত, মেধার জিনিস যে পরের, সে ধারণা তাহার ছিল না।

মেধাকে খবর দিয়া সে সুধীনের বাড়ীর দিকে লম্বা পা ছুটাইল। সুধীন তখন বাজার হইতে ফিরিতেছিল, পথেই যতীন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল,—"হ্যাঁ সুধীন দা, দাদা কবে আসছে বল না?"

সুধীন তাড়া দিয়া বলিল, "কবে আসছে তা আমি কি জানি। সর, পথ আটকাসনে, বাজারে বড্ড দেরী হয়ে গেছে, বাড়ীতে মা আবার বকতে আরম্ভ করবেন।"

যতীন তাহাকে ছাড়িল না, অনুনয়ের সুরে বলিল, "বল না সুধীন দা, তোমার পায়ে পড়ি—।"

বিরক্ত সুধীন বলিল, "ভাল বিপদ রে; তোর দাদা তো আমায় দিন ঠিক করে কিছু বলে নি, বলেছে দুদিনের জন্যে একবার এখানে এসে তোদের সব দেখে শুনে যাবে, কোথায় যাচ্ছে—আর ফিরবে কি না—"

কথাটা সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতাতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই ঝাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল রবীন যে নিকোবর দ্বীপে যাইতেছে সে কথা বাড়ীতে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে, কি জানি যদি পূর্ব্ব হইতেই মা কাঁদিতে আরম্ভ করেন।

যতীন সোৎসুকে বলিল, "ফিরবে কিনা বলছো কেন সুধীনদা, দাদা কোথায় যাবে ?"

সুধীন বলিল, "কোথায় যাবে—কলকাতাতেই ফিরবে, সে আসুক বাপু, এলে সে সব খোঁজ নিস, আমায় এখন ছেড়ে দে।"

যতীন বলিল, "আচ্ছা সুধীন দা, বলতে পার দাদা আমার ফুটবল কিনেছে কি না ?"

অতিরিক্ত বিরক্ত হইয়া সুধীন বলিল, "জানি নে বাপু, বলছি যদি সে আসে তবে তার কাছে খোঁজ করিস। আমার পথ কেন আটকাচ্ছিস, ছেড়ে দে।"

যতীন পথ ছাড়িয়া দিল।

একটা ফুটবলের জন্য তাহার উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। বৈকালে ছেলেদের সহিত মাঠে খেলিতে গিয়া ফুটবলটার পানে তাকাইয়া সে ভাবিতেছিল, এই রকম একটী বল তাহার নিজের হয়। ধনীপুত্র নরু তাহাকে ঠাট্টা করে, বিদ্রুপ করে—কেন না সে গরীব হইলেও উচ্চাভিলাষ তাহার বেশী, ধনী পুত্র নরু ইহা সহ্য করিতে পারে না। বাল্য হইতে সে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে, দরিদ্র কখনও ধনীর সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না, স্বর্গ ও মর্ত্তে পার্থক্য যতখানি, ধনী ও দরিদ্রে পার্থক্য ততখানি। দরিদ্রের উচ্চাশায় সে না হাসিয়া থাকিতে পারে না, না বিদ্রুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সে যতীনের উচ্চাভিলাষের কথা শুনিয়া একদিন স্পষ্টই বলিয়া ফেলিয়াছিল—কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ হইয়াছে, ইহার ঔষধ একটী আছে, এক ডোজ পড়িলেই সারিয়া যায়।

ডাক্তারের মত বিজ্ঞভাবে নরু প্রেস্ক্রপশান করিয়া দিল বটে—ঔষধের ব্যবহার করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই, কেন না পড়ায় যতীন খুব ভাল ছেলে, স্কুলে মাষ্টারদের কাছে তাহার বড়ই আদর। স্বয়ং জমীদার বাবু তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছেন, উৎসাহ দিয়াছেন। নরু প্রকাশ্যে আর যতীনকে কিছু বলিতে পারে নাই, অনুগত বন্ধুদের কাছে সগর্ব্বে বলিয়াছিল—"আচ্ছা, থাকতে দাও না, আমি আগে বড় হই তার পরে ওর ভিটে মাটী করে দেব, তবে আমার নাম। আর গোটা কত বছর পার হতে দাও, আমি আগে সব হাতে পাই—তার পর।"

এ শাসনের একটু মূল্য ছিল, যতীনদের বাড়ী ও বাগান নরুদের জমীতে ছিল, যতীনের মাকে খাজনা দিতে হইত।

যতীনের দাদা যে ফুটবল লইয়া আসিবে তখন যতীন মেধা ও যতীনের বউদি যে বাগানের মধ্যে চুপি চুপি ফুটবল খেলিবে এ কথাটা যতীন আর কাহাকেও ঠাট্টার ভয়ে বলিতে পারে নাই, মেধা মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া কথাটা ইহারই মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ যতীনকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তরুণ সেকেণ্ড মাষ্টার মুরারি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে যতীন, আজ যে খেলায় যোগ দিচ্ছ না? তুমি নেমে পড়, ও টিমে নরু আছে, এ টিমে তুমি না থাকলে সমান হয় না।

দলের মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলায় নরু ও যতীন যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিরাছিল, সমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইহারা। সেই জন্য দুই দলে দুইজনকে দেওয়া হইত।

নরু মৃদু হাসিয়া মুরারি বাবুর পানে তাকাইয়া বলিল, "স্যার, ওর দাদা ফুটবল কিনে নিয়ে আসছে কি না, সেই জন্যে ও এ সব পুরোণো বলে আর পা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।"

অল্পভাষী যতীন রাগে ফুলিতে লাগিল, বউদি ও মেধার কাছে সে যত কথা বলিতে পারে, আর কাহারও কাছে তত কথা বলিতে পারে না এই তাহার দোষ! বিস্ফারিত দুইটি চোখের অগ্নিদৃষ্টি সে নরুর উপর ফেলিল, নরু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না, বলটাকে সম্মুখে ভালভাবে রাখিতে রাখিতে বলিল, "আমাদের কোন দাদা তো কলকাতায় নেই স্যার যে, নতুন বল নিয়ে এসে দেবে, তাই আমাদের বাধ্য হয়ে এই বল নিয়েই খেলতে হবে।"

নরু যতীনের চেয়ে বছর দেড় দুইয়ের বড় এবং সে ফাষ্ট ক্লাসে পড়ে; তাহার কথায় ছোট বড় সকল ছেলেই হাসিয়া উঠিল, তরুণ মাষ্টারটীও মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

ফুটবলের কথাটা কেমন করিয়া যে ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্র হইল, তাহা যতীন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। রাগ করিয়া সে তখনই মাঠ ত্যাগ করিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। অনেক ভাবিয়া সে ঠিক করিয়াছিল এ মেধার কাজ, সেই এ কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে, যতটা রাগ সবই তাহার মেধার উপর গিয়া পড়িল। হতভাগীটাকে এই সময় একবার পথে দেখিতে পাইলে হয়, ধরিয়া আচ্ছা করিয়া দুচার ঘা ঠুকিয়া দিলে ভবিষ্যতে আর কোন দিন পরের কথা লইয়া মাথা ঘামাইবে না।

আর এও তো তাহার বড় অন্যায়, যতীন কোথায় চুপি চুপি

তাহাকে কথাটা বলিয়া গিয়াছে, সেই কথাটা সে সকলের কাছে বলিয়া বসিয়া আছে,—মনে করিতেছে সে যেন একটা বীরাঙ্গণার কাজ করিয়াছে। এবার একবার তাহার সহিত দেখা হইলে হয়, যতীন তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যতীনের কথা যাহার তাহার কাছে বলা উচিত কি না।

"যতীন দা—"

পিছন দিক হইতে একটা ছোট মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া তাহার কুসুম-পেলব ছুইটি হাতে যতীনের কটীদেশ জড়াইয়া ধরিল, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বা-বাঃ কি লম্বা তুমি যতীন দা, ভাবলুম চোখ ছুটো টিপে ধরে একটু মজা করব—কিন্তু—"

কঠিন হাতে সেই ছুইটী কোমল হাত সজোরে ছাড়াইয়া দিয়া যতীন কঠিন স্বরে বলিল, "আর মজায় দরকার নেই, এ দিকে আচ্ছা মজা বাধিয়ে দিয়েছিস মেধা, আমার এমন রাগ হচ্ছে যে, তোকে মেরে ফেলি।"

মেধা থতমত খাইয়া গেল, কি এমন মজা সে করিয়াছে, যাহা যতীনদার এতটা রাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

কাঁদ কাঁদ স্বরে সে বলিতে গেল—, "যতীন দা—"

"যাঃ তোর সঙ্গে আমার এই জন্মের মত আড়ি, আর কখনও যদি আমার সামনে আসিস মেধা, তা হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন। তোর জন্যেই তো ওরা ফুটবল নিয়ে আমায় অত কথা শুনিয়ে দিলে, তুই-ই তো বলেছিস ওদের—যে আমার দাদা—"

বাষ্প আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, উদ্যত প্রায় অশ্রু অভিমানের আগুনে উড়াইয়া দিয়া সে তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এই বলে দিচ্ছি—আর যদি আসিস তা হলে দেখবি মজা।"

হন হন করিয়া সে চলিয়া গেল। মেধা অবাক হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যখন আর তাহাকে দেখা গেল না তখন অঞ্চলে বাঁধা চুরি করিয়া আনা, পূজার জন্য নির্ব্বাচিত, নূতন গাছের নূতন সদ্যস্ফুট গোলাপ ফুলটী শতধা করিয়া ছড়াইয়া কাঁদিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

---

(৫)

রবীন বাড়ী আসিল।

ফুটবল আনার মত কোন লক্ষণ ছিল না। হাতে তাহার একটা স্যুটকেস্ ছিল বটে, অতটুকু বাক্সটার মধ্যে যে মস্ত বড় একটা ফুটবল ধরিতে পারে, তাহা কল্পনার অতীত। যতীনকে রবীন বুকের মধ্যে টানিয়া লইল, সজল চোখে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, কিন্তু ফুটবলের কথা কিছু বলিল না।

মাকে প্রণাম করিয়া রবীন মায়ের পায়ের কাছেই একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া পড়িল। নারায়ণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও কি রবি, আসনে বস, ওতে বসলি কেন?"

নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "বউ মা, আগে একখানা আসন দিয়ে যাও বাছা, ও দিককার কাজ হবে এখন।"

রবীন বিকৃত মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইয়া বলিল, "থাক মা, আসনের দরকার নেই, এই আমি বেশ বসেছি।"

যতীন খানিক কাছে কাছে ঘুরিল, ফুটবলের কোনও প্রস্তাব উঠিল না দেখিয়া গভীর হতাশায় তাহার বুকটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। যাহা লইয়া ছেলেদের সহিত এত কাণ্ড হইয়া গেল, মেধার সহিত আড়ি হইয়া গেল, সেই বলই আনিতে দাদা কি ভুলিয়া গেল?

সাবিত্রী উনানে আগুণ দিয়া তরকারী কুটিতেছিল। বাসী কাজ সব সারা হইয়া গিয়াছে, স্নান হইয়া গিয়াছে, রন্ধন চাপাইলেই হয়। অন্যমনস্কভাবে সে তরকারী কুটিতেছিল, হঠাৎ অতর্কিতে যে আঙ্গুল কাটিয়া যাইতে পারে সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

বাহিরে ওঘরের বারাণ্ডায় স্বামী ও শাশুড়ি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সে দিকেও তাহার কান ছিল না, আপনার অন্তরের বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে তাহাকে তখন তুমূল যুদ্ধ করিতে হইতেছিল।

স্বামীর দেখা পাইয়াছে সে বিবাহের সময়, একবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। চোখ তুলিয়া সে স্বামীর পানে তখন চাহিতে পারে নাই, মুখের কথা খসানো দূরে থাক। স্বামীর যে কথাগুলা কচিৎ কখনও মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত, আজ তাহা যেন তাহার মন ছাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আজ মনে পড়িতেছিল, দুই বৎসর আগেকার কথা, যে দিন সে স্বামীর সহিত পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল, তাহার দাদা শরৎ রবীনকে কি অপমানটাই না করিলেন। সেই দিনের কথাটা মনে করিতে সাবিত্রীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

হায়রে, তাহাকেই বা কত না লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, অপরাধ কাহার সেটা তো কেহই দেখেন নাই। সে বালিকা হিন্দু-ঘরের মেয়ে, নিজে তো পাত্র নির্ব্বাচন করেন নাই, তাহার দাদাই তো বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করেন, তিনিই তো বিবাহ দেন। পিতামাতার তখন-কত না আনন্দ—কালো মেয়ে তরিয়া গেল, সুপুরুষ স্বামী পাইল,

আনন্দ কি সেও পায় নাই? শুভদৃষ্টির সময় প্রথম দৃষ্টিপাতে সে যে সুধা পান করিয়াছে তাহাতেই এখনও বাঁচিয়া আছে।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর কথাগুলি তাহার মনে বড় বেদনাই দিয়াছিল, সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্র বালিকার মতই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল।

এ বিবাহে জুয়াচুরী তো রবীন করে নাই, জুয়াচুরী করিয়াছে তাহারই দাদা। সে ইচ্ছা করিয়াই কালো বোনকে দেখায় নাই—যদি রবীন পছন্দ না করে। হায়রে, এ জুয়াচুরীর ফলে কি হইল, দুইটী জীবন যে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল।

নিজের ত্রুটি সারিবার জন্য সে জোর করিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। সে একবৎসর এখানে আছে, এই এক বৎসরের মধ্যে রবীন বাড়ী আসে নাই। ইহার মূলে যে কি ছিল, তাহা নারায়ণী না বুঝিলেও সাবিত্রী বুঝিয়া মরমে মরিয়া গিয়াছিল। সে বুঝিতেছিল, সে এখানে আছে বলিয়াই মাতৃভক্ত রবীন মায়ের কাছে আসিতে পারিতেছে না, সে সরিয়া গেলেই পুত্র মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে যাইবে কোথায়, কোথায় সে আশ্রয় লইতে যাইবে, পিত্রালয়ের সঙ্গে সকল সম্পর্ক উঠাইয়া সে এখানে আসিয়াছে, এখন কোন মুখে সেখানে যাইয়া দাঁড়াইবে?

সে দিন রবীনের আসার কথা শুনিয়া সে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, রবীন হয় তো জানে না, সে এখানে আছে, তাই বুঝি সে আসিতেছে। তাহার সেদিন কোথাও চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল, যাইবে কোথায়?

আজ যখন রবীন বারাণ্ডায় উঠিতেছিল, তখন এক পলকের জন্ত *স্বামীর পানে তাকাইতে গিয়া সে আত্মহারা হইয়া কতক্ষণ যে চাহিয়াছিল,* তাহা জানে না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া বঁটি লইয়া বসিল। বড় কষ্টেই তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল,—হায় ভগবান, কেন এরূপ করিলে? ওই দেবতার মত স্বামী, সে হতভাগিনী কি তাঁহার পদ সেবার যোগ্যা? সে কেমন করিয়া নিজেকে স্বামীর স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে, ইহাতে সকলেই যে বিদ্রূপ করিবে! তাহার পিতামাতা ও ভ্রাতা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন ভাবিয়াছেন. কিন্তু প্রবঞ্চিত হইয়াছে কে,—রবীন নয় কি?

হুড়মুড় করিয়া যতীন প্রবেশ করিতেই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইল। পাছে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া যতীন আজও কিছু লক্ষ্য করে এই ভয়ে আগেই শুষ্ক হাসি খানিকটা মুখে টানিয়া আনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কই ঠাকুরপো, তোমার ফুটবল এসেছে?"

হতাশভাবে তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া যতীন বলিল, "না বউদি, দাদা তো এখনও বলের কথা কিছুই বললে না, বোধ হয় আনেনি।"

সাবিত্রী একটা বৃহৎ কুমড়া দুই খানা করিতে করিতে বলিল, "জিজ্ঞাসা করেছ?"

বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া যতীন বলিল, "জিজ্ঞাসা করতে পারলুম কই, দাদা এখন মার সঙ্গে কথা বলছে যে, এখন কি কিছু বলা যায়? দাদাকে তো চেন না বউদি, দাদা যখন কোন কথাবার্ত্তা কারও সঙ্গে বলে, তখন কথা বলতে গেলে দাদা একেবারে ভয়ানক রেগে ওঠে। থাক আগে ওদের কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে যাক, তারপর বলব এখন।"

সাবিত্রী খানিক চুপ করিয়া রহিল, একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদা হঠাৎ এখন এলেন যে? কেন এসেছেন সে কথা বোধ হয় মাকে বলেছেন, তুমি শুনেছ কি ঠাকুরপো?"

যতীন বলিল, "দাদা কোথায় চলে যাচ্ছে বছর খানেকের মতন, তাই মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দাদা যেখানে কাজ করে সেইখানকার সাহেব চলে যাচ্ছেন, তিনিই দাদাকে নিয়ে যাচ্ছেন। জানো বউদি, দাদার দেড়শো টাকা মাইনে হবে সেখানে গেলে, কিন্তু কলকাতায় থাকলে পঞ্চাশ টাকার বেশী পাবে না, সেই জন্যেই দাদা যাচ্ছে।"

সাবিত্রীর অজ্ঞাতেই বুকটায় খচ করিয়া একটা কাঁটা বিঁধিয়া গেল, সে নতমুখে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে কুমড়ার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "সে দেশ বুঝি বাংলার বাইরে?"

বিস্ফারিত চোখে যতীন বলিল, "বাংলার বাইরে কি—ভারতবর্ষের বাইরে। তুমি তো ভূগোলে পড়েছ, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জানো তো,—দাদা সেইখানে যাচ্ছে যে। সে নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে হবে, ঢেউয়ের তালে তালে জাহাজ উঠবে—নামবে, কেমন মজা,—না বউদি? আমার ইচ্ছে করে অমনি করে জাহাজে উঠে যেতে—সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে উঠতে পড়তে।"

"নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ"· সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কথাটা বলিয়াই চকিতে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিল,—"কেন সেখানে যাচ্ছেন শুনেছ?"

যতীন বলিল, "বাঃ, অত টাকা মাইনে পাবে—যাবে না?"

শান্তভাবে সাবিত্রী বলিল, "বেশী টাকা পেলেই বুঝি যেতে হয়?

এখানে—এতদূরে মা ভাই পড়ে থাকবে, কতকালে আবার দেখা হবে তা কে জানে !"

কথাটা বলিতে বলিতে সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। বুকটা তাহার বড় ভারি হইয়া উঠিয়াছিল,—কতকালে, হায়রে, তাহা কে বলিতে পারে? কে জানে তাহার জন্যই রবীন এতদূরে—ভারতের বাহিরে যাইতেছে কি না? সে কালো—তাহার আকর্ষণী শক্তি নাই বলিয়াই, সে স্বামীকে বাঁধিতে পারে নাই, স্বামীর চিত্তকে সংসার হইতে বিমুখ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মা ভাইয়ের আকর্ষণও নাই কি? যিনি কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, বুকের দুধে তাহার রক্ত সঞ্চার করিয়াছেন, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পানেও সে চাহিতেছে না?

সাবিত্রীর চোখ দুইটী জ্বালা দিতেছিল, সে তরকারীর পানে তাকাইয়া ছিল, যতীনের দিকে তাকাইবার সাহস তাহার হয় নাই,—কি জানি, যদি ধরা পড়িয়া যায়, সে বড় লজ্জার কথা যে।"

"যাই হোক দাদা যে এখন বছর তিন চারের মতনই যাবে এ ঠিক কথা,—না বউদি? এখান হতে এই কাছে কলকাতা,—কত লোক মাসে দু'বার তিনবার করেও দেশে আসছে, কিন্তু দাদা এক বছর পরে এলো, এতেই মনে করে দেখ—নিকোবর দ্বীপ হতে দাদা এখন সহজে কিছুতেই আসছে না। তিন চার বছর কি—হয় তো দশ বার বছরও সেখানে কাটিয়ে দিতে পারে, না বউদি?"

সে সরল ভাবেই কথা বলিয়া যাইতেছিল, তাহার এক একটা কথা তীরের ফলার মত সাবিত্রীর বুকে বিঁধিতেছিল, সে উত্তর দিতে পারিতেছিল না।

যতীন আপন মনেই বলিয়া চলিল, "আগে কিন্তু দাদা এ রকম ছিল না বউদি, বছরে চার পাঁচবার করে বাড়ী আসত। ওই যে আর বছর হতে কি হয়েছে—, আরে, তোমার হাতখানা এমন করে কেটে ফেললে কি করে? ইস, বড্ড রক্ত পড়তে লাগিল যে; নাঃ, তুমি ভারি অন্যমনস্ক বউদি, কথা শুনতে শুনতে একদম ভুলে যাও যে হাত বঁটিতে কাটতে পারে। দাঁড়াও, তুমি ততক্ষণ চেপে ধরে রাখ, আমি দৌড়ে ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এসে বেঁধে দেই।"

বাস্তবিকই হাতটা বড় বেশী রকমই কাটিয়াছিল, সাবিত্রী প্রাণপণে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়াছিল তবুও রক্ত বন্ধ হইতেছিল না, কনুই বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

যতীন লাফাইয়া উঠিতেই সে যতীনের হাত চাপিয়া ধরিল,—না না ঠাকুরপো, রক্ত এক্ষুণি বন্ধ হয়ে যাবে এখন, তোমায় কিছু আনতে দৌড়াতে হবে না। মা জানতে পারলে এখনি দৌড়ে আসবেন, অনর্থক একটু হাত কাটার জন্যে একটা গোলমাল করা মাত্র। তুমি একটু বসো, আমি এখনি লঙ্কা বাটা দিয়ে রক্ত বন্ধ করছি দেখ।"

যতীন বসিয়া পড়িয়া বিরক্তভাবে বলিল, "হুঁ, লঙ্কা বাটা দিলে রক্ত বন্ধ হবে না ছাই হবে। মাকে বললে এতক্ষণ যা হয় কিছু দিয়ে দিত, লঙ্কা দিলে জ্বলে মরবে এর পরে—দেখো এখনি।"

সাবিত্রী সত্যই ক্ষতস্থানে লঙ্কা খানিকটা দিয়া বলিল, "জ্বলবে না, ভাল হয়ে যাবে। যাক গিয়ে ও কথা, আজ ইস্কুলে যাবে না ঠাকুরপো?

যতীন হাসিয়া উঠিল, "বারে, আজ যে রবিবার তা বুঝি তোমার খেয়াল নেই?"

সাবিত্রী বলিল, "তা বটে, আমার মোটে মনেই ছিল না। মেধার মা আজ সকালে তোমায় একবার ডেকেছিলেন, যাও না ঠাকুরপো।"

যতীন প্রশ্ন করিল, "কেন তা জানো?"

অন্যমনস্ক সাবিত্রী বলিল, "শুনেছি মেধার বড্ড জ্বর হয়েছে, সে তোমায় নাকি ডেকেছে।"

যতীন খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেল।

ও ঘর হইতে শ্বাশুড়ী ডাকিলেন, "মা, রবীনকে যা হয় কিছু জলখাবার দিয়ে যাও।"

সাবিত্রীর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছিল, কেমন করিয়া সে রবীনের সম্মুখে গিয়া জলখাবার দিবে? যদি সে ঘৃণাভরে সম্মুখ ছাড়িয়া সরিয়া যায় সেও ভাল, যদি মায়ের সম্মুখেই তাহাকে সম্মুখে আসতে নিষেধ করে, পাছে মা জানিতে পারেন? ভগবান, সাবিত্রীর হৃদয়ে বল দাও, সে যেন অকম্পিত পদে স্বামীর সম্মুখে যাইতে পারে, মা যেন তাহার ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছু না দেখিতে পান।

পিছনের বাগানে কয়েকটী নারিকেল গাছ ছিল, কোন এক পূর্ব্ব পুরুষ ভবিষ্যদ্বংশিয়ের জন্য এই কয়টী গাছ রোপণ করিয়া গিয়াছেন কে জানে। ওদিকে তিন চার বৎসর গাছে একটী ফলও হয় নাই, আজ এক বৎসর হইল আবার নারিকেল ধরিতেছে। নারায়ণী বধূ বড় পয়মন্ত বলিয়া সকলের কাছে বর্ণনা করিতেন। রবীন নারিকেল বড় ভালবাসিত, তিন চারি বৎসর সে গাছের নারিকেল খাইতে পায় নাই, নারায়ণীর মনে

এই বড় দুঃখ জাগিয়া ছিল। রবীন আসিতেছে সংবাদ পাইয়া তিনি যত গুলি ডাব ও ঝুনা নারিকেল ছিল, সব পাড়াইয়াছিলেন। নিজের হাতে তিনি নারিকেলের চন্দ্রপুলী, চিঁড়া প্রভৃতি নানারূপ খাবার তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

একখানা বড় রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া ডাবের জল লইয়া সাবিত্রী যখন দিতে যাইতেছিল, তখন রবীন তাহার মাকে বলিতেছিল, "ওকে কেন মা এ কষ্টের সংসারে রেখেছ, পাঠিয়ে দিলেই হতো। বড়লোকের মেয়ে, যার পেছনে দুটি তিনটি ঝি নিয়ত ঘুরত তাকে এখানে রেখে এত কষ্ট দেওয়া উচিত হয়নি মা। আমাদের গরীবের ঘর, সব কাজ নিজেদের হাতেই করতে হয়, না পারলেও ঝি চাকর রাখবার যোগ্যতা কই মা?" তুমি পার,—কেননা তুমি গরীবের মেয়ে, কাজ করা অভ্যাস আছে বলেই গরীবের ঘরে পড়েও খেটে খেতে পারছ, তা বলে বড়লোকের আদুরে মেয়েকেও যে পারতে হবে এমন তো কথা নেই মা। ওরা কি কখনও এক গ্লাস জল নিয়ে খেয়েছে, না নিজের জায়গাটী বিছানাটী পর্য্যন্ত করে নিয়েছে? সেখানকার কথা তুমি জান না মা,—যদি চোখে দেখতে তা হলে কখনই একে তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও এখানে রাখতে চাইতে না।"

সাবিত্রী কোনক্রমে খাবার নামাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি পার্শ্বের ঘরের মধ্যে আত্মগোপন মানসে ঢুকিয়া পড়িল।

এ কি নির্দ্দয় পরিহাস, এ কি কঠোর হৃদয়? সে যে স্বেচ্ছায় এই দরিদ্রের গৃহে আসিয়াছে, ঐশ্বর্য্য সম্পদ সে তো কিছুই চায় না। সে ধনীর কন্যা এই তাহার অপরাধ কিন্তু সে কথা সে যে অতীতের মধ্যে রাখিতে চায়, বর্ত্তমানে সে দরিদ্রের গৃহের বধূ মাত্র—আর কিছু নয়—আর কেহ

নয়। আত্ম সম্বরণে অসমর্থা সাবিত্রীর দুই চোখ দিয়া অজ্ঞাতে দুই ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

নারায়ণী বলিলেন, "তুই ও সব কথা বলিস নে রবীন, বউমা যে কি করে এখানে চলে এসেছে তা যদি জানতে পারতিস, তবে কখনো এ রকম করে ওকে বলতে পারতিস নে, ওরে পাগলা, বড়লোকের মেয়ে হওয়া মস্ত বড় দোষ ভাবছিস, কিন্তু তার মনটা দেখেছিস কি? সে এই দরিদ্রের ঘরকেই বরণ করে নিয়েছে, ধনীর প্রাসাদকে পেছনে ফেলে এসেছে। এই একটা বছর বউমা আমার এখানে অচলা হয়ে আছে। মা আমার লক্ষ্মী, দুদিন যদি থাকিস তবে দেখতে পাবি।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া রবীন বলিতে গেল—"তাই নাকি," কিন্তু, কথাটা স্পষ্ট ফুটিল না। অহঙ্কারী ধনীর আদরিণী কালো মেয়েকে সে এতটুকুও ভালবাসিতে না পারুক, যথার্থ নারীকে সে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

---

(৬)

অন্য দিনের মত সে দিনও নারায়ণী শ্রান্তদেহে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলে, সাবিত্রী তাঁহার পদসেবা করিতে বসিল। এটী তাহার নিত্য নিয়মিত কার্য্য, একটা দিনও এ কাজ তাহার বাকি থাকে না।

উঠিয়া বসিয়া পা দুখানা সরাইয়া লইয়া বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার ললাটের উপর পতিত অসংযত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে নারায়ণী বলিলেন, "আজ আর আমার পা টিপতে হবে না মা, তুমি যাও শোও গিয়ে, বড্ড রাত হয়ে গেছে।"

সাবিত্রী নতমুখে বলিল, "শুচ্ছি মা, আপনার একটু সেবা করে তার পরে—"

নারায়ণী বলিলেন, "না মা, রোজই তো সেবা কর; ভগবান নিত্যি অসুখও দিয়েছেন, সেবা করতে করতেই তোমার দেহটা গেল। আজ যাও মা, শোও গে, কাল আবার দিয়ো, দিন তো পালিয়ে যাচ্ছে না, তোমার শ্বাশুড়ীও মরছে না, তেমন কপাল আর হল কই?"

শ্বাশুড়ীর আদেশের বিরুদ্ধে সাবিত্রী আর কথা কহিতে পারিল না। যেখানে প্রত্যহ সে শুইত, সেইখানে মাদুরটা বিছাইয়া লইতেছিল, বিস্মিতা নারায়ণী বলিলেন, "ওকি বউমা, তুমি এ ঘরে বিছানা করছ যে?"

আড়ষ্টবৎ সাবিত্রী দাঁড়াইয়া রহিল, মুখখানা সে তুলিতে পারিতেছিল না। হায়রে, কেমন করিয়া বলিবে সে কালো বলিয়া শুভদৃষ্টি তাহার অদৃষ্টে অশুভ হইয়া গিয়াছে, বিবাহের রাত্রি হইতে এই দুই বৎসরের মধ্যে একটা দিন মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর অন্তরের কাছেও সে স্ত্রীর দাবী লইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। সে কেমন করিয়া বলিবে—শুধু যে তাহার জীবনই ব্যর্থ হইয়াছে. তাহা নয়, স্বামীর জীবনও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, আর সেই ব্যর্থজীবন লইয়াই তাহার স্বামী দূরে—বহু দূরে চলিয়া যাইতে চায়, যেখান হইতে দু চার বছরে ফিরিতে পাইবে না।

নারায়ণী মৃদু প্রদীপালোকে বধূর মুখপানে তাকাইলেন, একি, ম্লান নতমুখ! তিনিও প্রথম হইতেই এই সন্দেহ করিয়াছিলেন; বধূ এখানে আসা পর্য্যন্ত রবীন এখানে আসা ছাড়িয়া দিয়াছিল, ইহাতেই প্রথম তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ রবীন যখন সত্যই আসিল, তখন তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইয়াছিল, সেই সন্দেহ এই মুহূর্ত্তে আবার জাগিয়া উঠিল। তাই কি সত্য—ভগবান—তাই কি? না—না, ওগো প্রভু, সে সন্দেহ মিথ্যা হোক, এমন লক্ষ্মী প্রতিমাকে এমন করিয়া দগ্ধ করিয়া মারিয়ো না।

"বউমা—"

সে কণ্ঠস্বরে এমন একটা আকুলতা ছিল, যাহাতে সাবিত্রী মুখ না তুলিয়া থাকিতে পারিল না, চকিতের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর ফেলিয়াই মুখ নত করিল।

নারায়ণী বলিলেন, "যাও মা, ও ঘরে যাও। দরজা খোলা আছে, আমি এইমাত্র ভেজিয়ে দিয়ে এসেছি, যাও আর দেরী কর না।"

"মা—" অস্ফুটস্বরে সাবিত্রী কি বলিতে গেল।

নারায়ণী শক্ত হইয়া বলিলেন, "সে আমি তোমার কোন কথা— কোনও অনুযোগ শুনতে চাইনে। আমার আদেশ, তোমার এ ঘরে শোওয়া হবে না। যাও না বাপু, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমি আর বসতে পারছিনে, রোজ জ্বরের তো কামাই নেই, আর রাতও তো বড় কম হয় নি। তুমি বার হও, আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি।"

সজল দুটি চোখের দৃষ্টি একবার নারায়ণীর মুখের উপর ফেলিয়া, নির্ব্বাকে সাবিত্রী বাহির হইল, নারায়ণী সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। একবার দরজার ঈষৎ ফাঁক দিয়া দেখিয়া লইলেন পার্শ্বের ঘরের দরজা সেইরূপই অর্দ্ধ বন্ধ রহিয়াছে, তাহার ফাঁক দিয়া একটু আলোর রেখা বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। পরম নিশ্চিন্ত ভাবে দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া নারায়ণী নিদ্রিত যতীনের পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন।

রবীনের কক্ষ ও নারায়ণীর কক্ষ এরই মাঝামাঝি দেয়ালে ঠেস দিয়া সাবিত্রী স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে দশদিশি উছলিয়া পড়িতেছিল, নীল আকাশের গায়ে শুভ্র থালার মত শুক্লা একাদশীর চাঁদখানা দোলা খাইতে খাইতে তখন অনেক দূর ভাসিয়া উঠিয়াছে, আশে পাশে দুটি চারটি তারা মলিন দীপ্তি ছড়াইতেছে। অদূরে প্রবাহিতা গঙ্গা নদী, বাগানের বড় বড় গাছগুলির তলার কালো ছায়া ভেদ করিয়া দৃষ্টি ওদিককার শুভ্র জ্যোৎস্নাসিক্ত নদীর উপরে আগে গিয়া পড়িতেছে। ও পারে ধু ধু করিতেছে মাঠ, মাঝে

মাঝে দুই একটা বাবলা, প্রভৃতি বড় গাছ। কোথাও বড় বড় ঝোপ মাথায় গায়ে প্রচুর চাঁদের আলো মাখিয়া বুকের মাঝে ভীষণ অন্ধকার লুকাইয়া আছে, এইরূপই কোন একটা ঝোপের মধ্য হইতে একটা সদ্যজাগ্রত পাপিয়া শুভ্র জ্যোৎস্না দেখিয়া ভোর হইল ভাবিয়া ডাকিয়া উঠিল—চোখ গেল, চোখ গেল। কোথা হইতে আর একটী অতি মিষ্ট স্বর জাগিয়া উঠিল—বউ কথা কও—বউ কথা কও। বুঝি পাপিয়ার ডাকে পাখিটির তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল, সে তন্দ্রালস নেত্র মেলিয়া আজিকার অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী যামিনীকে দেখিয়া, মুগ্ধ প্রাণে গাহিয়া উঠিল—"বউ কথা কও, বউ কথা কও। কবে কোন দিন এমনই এক রাতে বুঝি প্রণয়ী তাহার প্রণয়িণীকে সাধিয়াছিল। চোর পাখি তাহা শুনিয়াছিল, কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহারা কোথায় গিয়াছে, তাহারা কে ছিল হয়তো সে চিহ্নটীও এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীলা ধরিত্রীর বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে, অতীতের সেই স্মৃতি জাগাইয়া দিতে আছে, এই পাখিটি। সময় নাই, অসময় নাই—সে গাহিয়া যায়—বউ কথা কও, বউ কথা কও।

উঠানের একধারে যতীনের স্বহস্তে প্রোথিত, সযত্নে বর্দ্ধিত হেনা ফুলের গাছটী ফোটা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কোথা হইতে মাতাল বাতাস ছুটিয়া আসিয়া গাছটিকে দুলাইয়া তাহার গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

অনেক দূরে নদীর ওপারে ছেলেদের কুটীর, সেখান হইতে বাঁশীর শব্দ নদীর বুকের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে এপারে আসিতেছিল। আজ ছেলেদের কুটীরে বিবাহ, মেয়েদের হুলুধ্বনি মাঝে মাঝে পড়িতেছিল,

শঙ্খ বাজিতেছিল। সকল শব্দ ডুবাইয়া দিয়া সকলের উপরে আসন গাড়িয়া লইয়াছিল—সেই বাঁশীর সুরটী। বড় করুণ সুরেই বাঁশী বাজিতেছে, কাহার হৃদয়ের গোপন ব্যথা বাঁশীর সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, বাদক কোনও নিভৃত স্থান খুঁজিয়া লইয়াছে, সেইখানে হয় তো কোমল দুর্ব্বা শয্যার উপরে সারাদিনের কর্ম্মে ক্লান্ত দেহখানি বিছাইয়া দিয়া, সে বাঁশীতে সুর দিয়াছে। বাঁশীর সুরে সব-হারা'র বেদনা ঝরিতেছে, শুনিলে মনে হয় বিশ্বে তৃপ্তি নাই, সুখ নাই, আছে শুধু বেদনা, আছে শুধু চোখের জল।

বুকের উপর হাত দুখানা পাশাপাশি রাখিয়া সম্মুখে নদীর পানে তাকাইয়া সাবিত্রী দাঁড়াইয়াছিল। সব সুন্দর সব সুন্দর! আজিকার জ্যোৎস্না যাহার উপর গিয়া পড়িয়াছে তাহাই সুন্দর, রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। কবিগণ চাঁদের চুম্বনের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—সে কথা যথার্থ। অন্ধকার যাহা বিষাদময় করিয়া তুলে, রসহীন করিয়া ফেলে, জ্যোৎস্না তাহাকে রসযুক্ত করিয়া দেয়, আনন্দময় করিয়া ফেলে। আজিকার জ্যোৎস্নাময় রাত্রি কি সুন্দর—কি রমণীয়!

চোখ ফিরাইতেই নিজের কালো হাত দুখানার পানে সাবিত্রীর দৃষ্টি পড়িল, বুকের মধ্যে ঝন ঝন করিয়া উঠিল, চাঁদ, তোমার চুম্বনে সুন্দরতা আছে, ভীষণকেও তুমি রমণীয় কর, কালোকে সুন্দর করিতে পারিলে কই? তোমার শুভ্র আলোয় সাবিত্রীর কালো বর্ণ আরও কালো দেখাইতেছে যে। ওগো, তোমার শুভ্রতা একটু কি দান করিতে পার না—যাহা তাহার কালো বর্ণকে গৌর করিয়া দিতে পারে?

"কে—কে ওখানে—?"

দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া বাহিরের শান্ত চন্দ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির পানে তাকাইবার প্রলোভন রবীনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল, অধীর হৃদয়ের যে ব্যাকুল উচ্ছ্বাস বাঁশীর সুরে ঝড়িয়া পড়িতেছিল, তাহার হৃদয়ও সেই সুরে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর চাপা দিয়া সে নিস্তব্ধে বাঁশীর গান শুনিতেছিল। যখন ঢং ঢং করিয়া দূরস্থিত জমিদার বাড়ীর ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল, তখন তাহার জ্ঞান হইল, সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিতে উঠিল।

মুখ ফিরাইতেই সাবিত্রীর মুখখানা রবীনের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল, রবীন চমকাইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, দরজা বন্ধ করা হইল না।

যখন রবীনের ঘুম ভাঙ্গিল তখনও আলোটা দীপ্তভাবেই জ্বলিতেছে, ঘড়িতে তখন দুইটা বাজিয়া সতের মিনিট হইয়াছে। চাঁদের শেষ আলো পৃথিবীর বুকে বিদায় চুম্বন দিয়া গিয়াছে, ঝোপের বুকে, গাছের তলে যে অন্ধকার গোপনে পুঞ্জীকৃত ছিল, সেগুলা চাঁদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া চুপ করিয়াছে, বোধ হয় আবার তাহার নীড়ের মাঝে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অন্য পাখিটি তখনও রহিয়া রহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতেছে—বউ কথা কও—বউ কথা কও। বেচারার মনে বুঝি তখনও আশা জাগিয়া আছে বউ কথা কহিবে, কেননা আকাশ এখনও চাঁদের চরণ ক্ষেপের চিহ্নে উজ্জ্বল, বউ যে এমন নিশি ব্যর্থ করিয়া বসিবে, সে আশা সে মোটেই করে নাই। সেই অজানা বিরহীর বাঁশী বাজিয়া বাজিয়া এখন থামিয়া গিয়াছে, সে

বোধ হয় তাহার কোমল দূর্ব্বা শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জাগ্রতে সব-হারার দুঃখ তাহার এতক্ষণ বুঝি ফিরিয়া পাওয়ার সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন বাহিরে আসিল। বারাণ্ডায় যেখানে সাবিত্রী দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে খানিকটা জায়গা গাছের ফাঁকে ভাসিয়া আসা এক টুকরা জ্যোৎস্নায় শুভ্র হইয়াছিল, সেই জ্যোৎস্নাখণ্ডটীর মাঝখানে শ্যামাঙ্গিনী সাবিত্রী ঘুমাইয়া রহিয়াছে। অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছে, নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া আসা—হেনার গন্ধে সিক্ত শীতল বাতাস তাহার শুভ্র বসন, কালো মাথার চুল লইয়া খেলা করিতেছে।

রবীন ব্যথিতনেত্রে স্ত্রীর পানে তাকাইয়াছিল। হায় অভাগিনী, বিশ্বের তাড়িতা আজ তুমি, তাই গৃহে তোমার স্থান নাই, বাহিরে তোমার স্থান। পৃথিবীর অধিবাসী তোমায় স্নেহ মমতা ভালবাসা দিতে কার্পণ্য করিয়াছে, প্রকৃতি তো কার্পণ্য করে নাই, প্রকৃতি তাহার বুকের শ্রেষ্ঠ জিনিস তোমায় উপহার দিয়াছে। গৃহের মানুষ এমন চাঁদের আলো প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারে নাই, এমন কুসুম গন্ধ পূরিত বাতাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে পারে নাই, কেননা তাহারা বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতি বদ্ধের জন্য নয়, মুক্তের জন্য। তুমি আজ মুক্ত, তুমি প্রকৃতির আজ একার জিনিস।

রবীন বুঝিল—মা তাহাকে ওকক্ষে যাইতে বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কালো মেয়েটীর এমন সাহস নাই যে সে স্বামীর কাছে প্রবেশ করিতে পারে। কতক্ষণ সে এইখানে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়াছিল তাই বা কে জানে, এখানে একা থাকিতে হয় তো কত ভয়ও তাহার

মনে উদিত হইয়াছিল, তবু সে স্বামীর কক্ষের দ্বার মুক্ত দেখিয়াও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সে কেবল নিজের পানে চাহিয়া থাকে, সে বলিতে পারে নাই, রবীনের পত্রের কথাও প্রকাশ করে নাই। অভাগিনী—হাঁ অভাগিনী বই কি? যত ব্যথা সে পাইতেছে, সবই তাহার বুকের ওই হাড় কয়খানির নীচে স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকিতেছে, একদিন এই ব্যথারাশী এতই জমিয়া উঠিবে, যে দিন সে সেই ভারে নুইয়া পড়িবে, সেই ব্যথা তাহার প্রাণখানাকে, দেহ খানাকে ছাপাইয়া উপছাইয়া পড়িবে।

উঠানের মাঝখানে যে নারিকেল গাছটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার তলায় প্রচুর অন্ধকার জমিয়া আসিলেও মাথায় তখনও জ্যোৎস্না জাগিয়াছিল। সেই জ্যোৎস্নাসিক্ত বাতাসে কম্পমান পাতার উপর বৃহদাকার একটা পেচক আসিয়া বসিল, পাতা নড়ার সর্ সর্ শব্দ উঠিল, রবীন চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল।

বিকট কর্কশ স্বরে পেচকটা ডাকিয়া উঠিল, সেই সুর নিদ্রিতার নিদ্রা ছুটাইয়া দিল, সাবিত্রী ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল—"মা—"

রবীন বুঝিল যে সে ভয় পাইয়াছে, কাছে সরিয়া আসিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ভয় নেই, ঘরে যাও—এখানে একা পড়ে রয়েছ কেন?"

সাবিত্রী চোখ তুলিয়া চাহিল, বারাণ্ডার জ্যোৎস্না তখন মিশাইয়া গিয়াছে, অন্ধকার সকল স্থান জুড়িয়া একচেটিয়া রাজত্ব করিতেছে, সাবিত্রী স্বামীর মুখ দেখিতে পাইল না। মুখের কাপড় সরিয়া গিয়াছিল, চোখ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়া সে মাথা নত করিয়া বসিয়াই রহিল।

রবীন বলিল, "ঘরে যাও সাবিত্রী, মাকে ডেকে দেবো ?"

সে অগ্রসর হইতেছিল, রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত কণ্ঠে সাবিত্রী কেবলমাত্র বলিয়া উঠিল—"না—"

রবীন ফিরিয়া দাঁড়াইল, সাবিত্রীর উদ্দেশ্য সে বুঝিতে পারিতেছিল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ, মার ঘরে না যাও আমার ঘরে যাও, আমি বারাণ্ডায় থাকছি।"

সাবিত্রী নীরব, উঠা দূরে যাক, আরও মাথা নীচু করিয়া—যেন মাটীকে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল।

রবীন তাহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত বিরক্ত হইয়া উঠিল, তথাপি কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল, আমার ঘরে যাও, আমি এখানে সারারাত থাকলেও দোষ হবে না, কেউ নিন্দেও করবে না, কিন্তু তুমি যদি সারারাত এখানে থাক, কাল সকালেই দেশময় সে কথা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। এতে শুধু আমাদেরই লোকে নিন্দে করবে না সাবিত্রী, তোমার চরিত্রের পানে তাকিয়ে কথা বলতেও গ্রামের লোক কুণ্ঠিত হবে না।"

সাবিত্রী নড়িল না, কথাও কহিল না। অভিমান, দুঃখ, লজ্জা সমভাবে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানা জুড়িয়া বসিয়াছিল।

হাঁ, লোকের নিন্দার ভয়ে তাহাকে গৃহমধ্যে যাইতে হইবে, কিন্তু কেন? লোকে বুঝিবে না, সে তাহার জীবনের কতখানি বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার মধ্যে বিষাদের সুরই বাজে, আনন্দের রেখাও তাহাতে নাই। লোক নিন্দা? লোক নিন্দার ভয়ে তাহার স্বামী কাতর, তাই তাহাকে গৃহে যাইতে বলিতেছেন. নিজের পরিত্যক্ত শয্যা ছাড়িয়া দিয়া

বাহিরে আসিয়াই দাঁড়াইয়াছেন। ওরে নারী আরও অপমান সহিতে চাস, আরও শুনিতে চাস,—অনুগ্রহ আরও ভিক্ষা করিতে চাস? যেস্থানে তোরই অধিকার ছিল, নিজের ক্ষমতায় সেথায় প্রবেশের অনুমতী পাসনি, আজ লোক নিন্দার জন্য সেইস্থানে কৃপার দান গ্রহণ করিতে পারিবি কি?

না, সাবিত্রী তাহা পারিবে না। সাবিত্রীর প্রাণের মধ্যে রুদ্ধ রোদন, রুদ্ধ বেদনা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল,—না, আর যে পারুক সে পারিবে না, দয়ার দান সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না—যতই কেন না পর্য্যাপ্ত হোক। ভালবাসিয়া—স্নেহ করিয়া যদি কেহ উচ্ছিষ্ট এক কণা দেয়, তাহাই পর্য্যাপ্ত, কিন্তু লোকের ভয়ে—না,—ছিঃ— ।"

কালো মেয়ের জেদী স্বভাব দেখিয়া রবীন ক্রমেই পঞ্চমে চড়িতেছিল; সে আর অনর্থক কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিল না, স্ত্রীর পানে আর ফিরিয়াও চাহিল না, নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সাবিত্রীর তুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া খানিকটা জল ঝরিয়া পড়িল, সে দীপ্ত আকাশের পানে অশ্রুসিক্ত নেত্রে তাকাইয়া হাত তুখানা ললাটে ঠেকাইয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভগবান বল দিয়ো।"

মাথা তাহার আপনিই নত হইয়া পড়িল।

---

(৭)

পরদিনই রবীন চলিয়া যাইবে, মা তাহার যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। পুত্রকে অনিশ্চিত কালের জন্য সুদূর এক দেশে বেশী টাকার জন্য পাঠাইতেছেন মনে করিতে কতবার যে তাঁহার চোখ দুইটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল তাহার ঠিক নাই। একবার এমনও হইল যে তিনি রবীনের হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুই সেখানে যাস নে বাবা, কলকাতায় যা সামান্য মাইনেতে কাজ করছিলি তাই কর গিয়ে। আমার বেশী টাকায় দরকার নেই, এই ঘরে শুয়ে মরতে পারলে আর বেঁচে থেকে শাক-ভাত খেতে পারলেই আমি যথেষ্ট বলে মনে করব।"

মায়ের হাত হইতে হাত দুখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া শুষ্ক হাসিয়া রবীন বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ মা,—আমায় যে সেখানে যেতেই হবে, নইলে কিছুতেই চলবে না। পরশু সকালে সাহেব রওনা হবেন, আমাকেও রওনা হতে হবে কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে রয়েছে। তুমি ওরকম করছো কেন মা, আমি তো বলছি দুই বছরের মধ্যে আমি আসার চেষ্টা করব, নেহাৎ যদি না পারি দুই বছর পরে এমনি সময়ে ঠিক আসবই।"

চোখের জল চাপিতে চাপিতে বিকৃতকণ্ঠে নারায়ণী বলিলেন, কে জানে বাবা, আমার মনে হচ্ছে তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, আমার দিন যেন বড় সংক্ষেপ হয়ে এসেছে।"

অধীর ভাবে রবীন বলিতে গেল, "না মা, ও সব কথা তুমি বলো না, ওতে আমার—"

নারায়ণী বাধা দিলেন, হাতখানা তাহার মাথার উপর রাখিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আমার কথা আগে শোন বাবা, তারপর কথা বলিস। কর্ত্তা বেঁচে থাকতে একবার এক জ্যোতিষি এসেছিলেন, তখন তোরা কেউই জন্মাস নি। তিনি গুণে যা যা বলে গিয়েছিলেন সবই ঠিক হয়েছে দেখছি। আমাদের তখন ভাল অবস্থা ছিল, ক্রমেই এমনি হল, কর্ত্তা ঠিক তার নির্দ্দিষ্ট সময়েই মারা গেলেন, আমার দুইটী ছেলে হলেও ছেলেরা কেউ আমার মরণের সময় কাছে থাকবে না, সে কথাও ঠিক হবে, তা বুঝতে পারছি। তাঁর নির্দ্ধারিত মরণের সময় আমার এসেছে, তুইও কোথায় চলে যাচ্ছিস, যতীনও থাকবে কি না—"

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

রবীন জোর করিয়া একটুকরা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "তোমার যেমন বিশ্বাস মা, তাই একটা ভণ্ড গণকের কথা এখনও মনে করে আছ। সেদিন কলকাতায় এক গণকের কাছে আমার বন্ধুরা আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, গণক হাত দেখে বললে—তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হবে। যদিও কিছু বিশ্বাস করিনে তবু কে জানে কেন মনটা দমে গেল। কিন্তু তারপর মা—কত তিন দিন কেটে গেল—কই আজও তো মরিনি, মায়ের ছেলে আবার মায়ের কোলেই ফিরে এসেছি।"

কথা কয়টা বলিয়া রবীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"বালাই, ষাট, কি যে বলিস বাছা তার কিছু ঠিক নেই। তোরা কেন হাত টাত দেখাতে যাস বল দেখি, ও সব না দেখানোই

ভাল। আমার দিব্যি রবি, আর কখনও কাউকে হাত দেখাতে যাস নে।”

মা পুত্রের মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া গভীর আবেগে একবার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন, গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “তাই ভাবি তুই তো চললি বিদেশে—সমুদ্র পারে, যদিই আমার কিছু হয়,—না হয় জ্যোতিষির কথা ছেড়েই দিচ্ছি—তা হলেও আমার শরীরের অবস্থা দেখে তো বুঝতে পারছি,—যদি আমার কিছু হয় যতীনটার উপায় কি হবে?”

রবীন হাঁ করিয়া মায়ের পানে তাকাইয়া রহিল, কথাটা বুঝিতে পারিল না।

নারায়ণী গভীর আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “বউমার জন্যে ভাবি-নে, মা বাপ ভাই যতদিন আছে ওকে ওই খানেই রাখবে—যতদিন না তুই ফিরে আসিস। কিন্তু যতীন,—থাকে কোথায়—কার কাছে দিয়ে যাব বল দেখি? পনের বছর বয়েস হল এখনও সে ছেলে মানুষ বই তো নয়; আর যে দুরন্ত—ঘর পর কিছু মানে না, ওর জন্যেই তো আমার বড় ভাবনা রে ওকে কি করব?

রবীন বলিতে গেল, “মিথ্যে কেবল ভেবে এখন হতে—”

মলিন হাসিয়া রবীনের গায়ে হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে নারায়ণী বলিলেন, “সামনে বসে কথা বলছি তাই মনে জানছিস মিথ্যে ভাবনা, কিন্তু এই মিথ্যেই সত্যি হতে কতক্ষণ লাগে রবি? বরং বল আমরা যে বেঁচে রয়েছি এই মিথ্যে, সত্যি হয়ে যাবে মরণের দণ্ড যখন এসে গা ছুঁয়ে যাবে। ওরে বোকা, মরণকে আগে ভেবে রাখতে হয়, কেননা সে আসবেই—তাতে এতটুকু আশ্চর্য্য নেই, ভয় নেই, বিষাদ নেই। জগতে

মানুষের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য্য বলে আমার মনে হয়, মরণকে মিথ্যে মনে হয় না।"

রবীন মায়ের কথার ক্ষীণ প্রতিবাদটুকুও আর করিতে পারিল না, কেননা মা যে যুক্তি দেখাইলেন তাহার মধ্যে অযথার্থ কথা একটীও ছিল না।"

রবীন বলিল, "তবে ওকে আমার সঙ্গে দাও না মা, আমি ওকে সেখানে নিয়ে যাই।"

নারায়ণী বলিলেন, "তা কি হয় বাবা? তোকে ছেড়ে দিয়ে ওকে নিয়ে আছি, ওর মুখপানে তাকিয়ে আমি সকল ব্যথা ভুলি, ওকে চোখের আড়াল করলে আমি আর একটী দিনও বাঁচব না। ও কথা নয়, অন্য কোথাও বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখো, আমি মরলে তারপর ও সেই মতে থাকবে।"

রবীন মাথা চুলকাইয়া বলিল, "দাদার ওখানে—"

নারায়ণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, রুক্ষভাবে তিনি বলিলেন, "যতীন যদি পথে পথে ভিক্ষা করেও বেড়ায় রবীন, সে ভাল, তবু বীরেনের ওখানে যাবে না।"

রবীন মাথা নত করিল, মনে পড়িল বীরেন পিতাকে অপমান করিয়াছিল, সে কথা মনে থাকিলেও সে কতদিন বীরেনের বাড়ী গিয়াছে। সেই অতীতের স্মৃতি তাহার বুকের মধ্যে কাঁটা বিঁধাইয়া দিল, সে মুখ তুলিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নারায়ণী বলিলেন, "সে দিন ভশ্চার্য্যি মশাই বলছিলেন জমিদার মশাই নাকি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই

রাখবেন, ভবিষ্যতে সেই সমস্ত বিষয়ের মালিক হবে। তিনি নাকি এই রকম ছোট ছেলেরই সন্ধান নিচ্ছেন, যে দেখতে ভাল হবে, বংশে ভাল, লেখাপড়ায় অনুরাগ আছে; আমার যতীন তো কোন অংশেই খাটো নয় রবি, তাকেই দিলে হয় না?"

রবীন অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল, মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, তিনি কি ভাবে কথাটা বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখের এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না। উৎকণ্ঠাকুল রবীন বলিল, "হ্যাঁ মা; যতীনকে তুমি ঘরজামাই করে দেবে?"

শান্তস্বরে নারায়ণী বলিলেন, "না হলে ওর কি উপায় হবে বাবা, কে আছে, কে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে যথার্থ মানুষ করে তুলবে? ধর—যদিও আমি বাঁচি, আমার কি ক্ষমতা হবে ওকে মানুষ করে তুলতে?

বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে রবীন বলিয়া উঠিল, "আমি তো এখনও মরিনি মা।"

"বালাই, ও কথা মুখে আনিস নে রবীন—"

মা আবার তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন,—"আমি জানছি তোর ভাইকে শিক্ষিত যথার্থ মানুষ করে গড়ে তুলতে তুই তোর শেষ পয়সাটীও দিবি, কিন্তু কার কাছে দিবি বল দেখি? যতীনের যে সব সঙ্গী আছে এদের মধ্যে ভাল ছেলে একটীও নেই; সে যদিও এখনও দুরন্ত তবু তার মধ্যে শিশুর মত সরলতা আছে যা তার মত ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু কে বলতে পারে এই সব বদ ছেলেদের সঙ্গই তাকে মন্দ পথে নিয়ে যাবে না, যাতে পয়সার দরকার হবে অথচ সৎকাজে ব্যয় হবে না। আমি তোদের মা রবি, তোদের জীবন গঠে তুলবার ভার আমার উপরে—যেন তোরা মানুষ হতে

পারিস, যেন ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষাদাত্রী মাকে না অপরাধিনী করিস। তোদের ভাল মন্দ দেখছি বলে—তোদের জন্যে আমায় কতটা ক্ষতি সইতে হচ্ছে, তা কি কখনও কোনদিন ভেবে দেখেছিস রবীন? তোদের ভালো চিন্তা করতে করতে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠেছে, আমার মরণের সময়ও আমি তোদের ভাল চিন্তা করে যাব।"

রবীন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা জানি মা, মা যে কি তা আজ নূতন করে বলছ কি মা, সে তো অনেক দিনই জেনেছি। হয় তো জানতে পারতুম না, যদি বাবা বেঁচে থাকতেন তাঁর ওপর আমাদের অর্দ্ধেক ভার থাকতো; কিন্তু তা তো হয় নি মা, আমাদের সম্পূর্ণ ভার তোমার ওপরেই পড়েছে, আমাদের ভালমন্দ চিন্তা তোমাকেই একা করতে হয়েছে। আমি জেনেছি—মা কি, কি দিয়ে মায়ের বুক, মায়ের প্রাণ ভগবান্ তৈরী করেছেন। যতীনকে দিয়ে তুমি কি থাকতে পারবে মা,—তারা যদি না আসতে দেয়?"

শূন্যনেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসতে দেবে না।"

রবীন বলিল, "তা কি করে বলব মা, শুনেছি ঘর-জামাইয়ের স্বাধীনতা থাকে না।"

নারায়ণী দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর হাত সরাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "যদি নাও আসতে দেয় রবীন—আমি তাতেও রাজি।"

"তাতে ও রাজি?"

রবীন অবাক হইয়া মায়ের পানে চাহিয়া রহিল।

ক্লিষ্ট হাসিয়া নারায়ণী বলিলেন, "হ্যাঁ, তাতেও রাজি। অনেক ভেবে দেখলুমরে, আমার জন্যে কেন যতীনের উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করব? আমি আর কয়টা দিন বাঁচব, বড় জোর দুই বছর, না হয় চার বছর, তার পর আর কে যতীনকে আমার মত ভালবেসে কাছে পেতে চাইবে? এই স্বার্থভরা স্নেহের জন্যে ওর অমন জীবনটা নষ্ট করতে আমি রাজি নই। এর পর সবই তো ওরই হবে, এই দেশের প্রতাপশালী জমিদার হবে আমার যতীন,—সে পথে বেরুলে দুইদিক দিয়ে লোকে তাকে নমস্কার করবে,—উঃ, সে দিনটা আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। সে দিন আমি থাকব না, যতীন তো জানবে তার মা তারই জন্যে তাকে ত্যাগ করেছিল।

নারায়ণীর মুখখানা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কল্পনা চোখে তিনি যতীনকে মাননীয় জমিদাররূপে দেখিতে পাইতেছিলেন, আনন্দে তাঁহার কথা আর ফুটিল না।

রবীন স্থিরকণ্ঠে বলিল, "বেশ মা, আমি আজই কলকাতায় গিয়ে উমাপতি বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে ফেলব, কাল তোমায় পত্রে জানাব, তিনি যা বলেন। কিন্তু মা,—তুমি যতীনকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে থাকতে পারবে তো?"

মায়ের মুখের দীপ্তি নিভিয়া গেল, তিনি অপলকদৃষ্টি রবীনের মুখের উপর ধরিয়া রাখিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "পারব।"

রবীন বলিল, "এর পরে যতীনকে যদি তাঁরা আর এখানে না আসতে দেন অথচ তুমি যদি দেখবার জন্যে—"

নারায়ণী দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা দমন করিয়া ফেলিলেন, এযে তাঁহার সন্তানের

শুভ তিনি সন্তানের শুভার্থিনী যে। নারী এ জগতে লইয়া থাকিতে কিছুই তো আনে নাই, সে যে ত্যাগের পথ বাহিয়া আসিয়াছে, জীবনভোর তাহাকে দিয়াই যাইতে হইবে যে। নারীর চরম বিকাশ মাতৃত্বে—কেননা এই খানেই তাহার ত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত। মা হইলে তাহার মধ্যে স্বতন্ত্র কিছু আর থাকে না, সন্তানের জন্য মা যে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া ফেলে। না, নারায়ণী আর কোন দিকে চাহিবে না। তাঁহার তো সবই ফুরাইয়া গিয়াছে, দুই চারিদিন যে বাঁচিয়া আছেন সেই কয়দিন স্বার্থপরা হইবেন না; সন্তানের জন্যই তিনি সন্তানকে ত্যাগ করিবেন।

নারায়ণী বলিলেন, "না রবীন, আমি তাকে দেখতেও চাইব না, সে সুখে আছে জানলেই আমার তাকে পাওয়া হয়ে যাবে।"

রবীন উঠিতে উঠিতে ব্যথার হাসি হাসিয়া বলিল, "জ্যোতিষীর গণনায় ভুল যদিও ছিল, তুমি নিজেই তাকে সত্যি হওয়ার সুযোগ দিচ্ছো মা। একটা কথা ভাবছি—এর পরে কে তোমার দেখবে?"

নারায়ণী বলিলেন "বউ মা।"

জননীর অজ্ঞাতে বিকৃত মুখখানা স্বাভাবিক করিয়া রবীন বলিল, "সে যদি চলে যায়। যাওয়ার কথাই তো বটে, বড়লোকের মেয়ে, তোমার এখানে এত কষ্ট সইতে পারবে না।"

মা বলিলেন, "পারবে না কি, নিজেই করছে যে, এই একটা বছর ধরে।"

বিকৃতভাব এবার আর গোপন রহিল না, রবীনের মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—বোঝ না মা, ও বড়লোকের একটা খেয়াল মাত্র।

বড়লোকের মেয়েছেলেদের অনেক সময় অনেক অদ্ভুত খেয়াল দেখতে পাওয়া যায়, এও সেই রকম একটা খেয়াল বলে জেনো। খেয়াল মিটাতে এসেছে, মিটলেই চলে যাবে, তখন যতই বাধা দাও না—সব বাধা খসে যাবে। ওদের খেয়ালে তুমি যেন নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ো না, নিজের সত্বা জাগিয়ে রেখো।

বাহিরে বারাণ্ডায় স্বামীর জন্য পিঁড়ি পাতিয়া, তৈল গামছা দিতে আসিয়া সাবিত্রীর কানে শেষ কথাগুলি সবই গিয়াছিল। তৈলের বাটী তাহার হাতেই ছিল, সেটা কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া সমস্ত তৈলটা ছিটকাইয়া পড়িল। যতীন পার্শ্বের গৃহে লাটিম ঘুরাইতেছিল, মেধা তাহার খেলার সাহায্য করিতেছিল, তৈলের বাটী পড়িয়া যাইতেই যতীন হাত তালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার সেই হাসির শব্দে সাবিত্রীর চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, দরজার উপর দণ্ডায়মান স্বামী, তাহার বিশাল চোখে যে কি ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছে,—আমি তোমায় ঘৃণা করি, মন-প্রাণ দিয়া ঘৃণা করি।

সাবিত্রীর মনটা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, সে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন মুখের উপর টানিয়া তৈলের বাটীটা কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

---

(৮)

প্রথম আষাঢ়ের নবীননীরদ মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, রৌদ্রতপ্ত পৃথিবী সুশীতল জলের আশায় বর্ষণোন্মুখ আকাশের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া আছে। অসহ্য গুমট গরম, বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বৃষ্টি আসিতে বেশী বিলম্ব নাই।

নারায়ণীর শরীরটা তত ভাল বোধ হইতেছিল না, তিনি তখনও বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন। মনটাও তত ভাল ছিল না, রবীন আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন গিয়াছে এখনও তাহার পত্র আসে নাই, মায়ের মনে উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না।

যতীন বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া স্কুলের পাঠ্য বই লইয়া বসিয়াছিল, খুব মনোযোগের সহিত সে উপক্রমণিকার বণিক শব্দের রূপ করিতেছিল, কাল স্কুলে বণিক শব্দের চতুর্থীর দ্বিবচনে ভুল হইয়া গিয়াছিল, বণিগ-ভ্যামের স্থলে বণিজোঃ বলিয়া নিম্ন ক্লাসের ছেলে হিরু কর্তৃক মাষ্টারের আদেশে অপমানিত হইয়াছিল। যদিও উপক্রমণিকা তাহার দুই তিনবার শেষ হইয়া গিয়াছিল তথাপি সে আজ ইহাকে আর একবার শেষ করিবেই।

পিছন দিকে কে পা টিপিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহা যতীন লক্ষ্যই করিল না, সে তখন বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে মুখস্থ করিতেছিল। সহসা তাহার চোখ দুইটী কে চাপিয়া ধরিল, যতীন সে হাত দুইটী ছাড়াইবার জন্য খানিক চেষ্টা করিল, তাহার পর রাগতভাবে বলিয়া উঠিল,—"দেখ চোখ ছেড়ে দিবি তো দে নইলে—বুঝতে পারছিস তো, তোর হাড় মাস দুই যায়গায় করব।"

তাহার কথাও যা, কাজও তাহাই—মেধা তাহা জানিত, তাই সে তাড়াতাড়ি চোখ ছাড়িয়া দিল। যতীন ঘাড় ফিরাইয়া রাগতভাবে বলিল, "দেখ মেধা, সব সময়ে ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না। দেখছিস আমি এখন ইস্কুলের পড়া করছি, কে তোকে এখানে এখন আসতে বলেছে?"

মেধা শুষ্কমুখে বলিল, "বাঃ, তুমিই তো আসতে বলেছ।"

যতীন সজোরে মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, "আমিত না,—তোর সব মিথ্যে কথা। আমি তোকে বলব এই সকালে এখানে আসতে—এ কখনও হতে পারে? তুই ভারি মিথ্যে কথা বলতে শিখেছিস মেধা, যা দূর হ বলছি।"

মেধার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সে দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "বারে, আমি বুঝি মিথ্যে কথা বলছি? কাল সন্ধ্যের সময় তুমি না বললে, আজ সকালে আসতে, রায়েদের পেয়ারা বাগানে পেয়ারা পাড়বে। নিজে বলে এখন আমারই সব দোষ হয়ে গেল। উঃ ভারি তো জমিদারের জামাই হবে কিনা, তাই ভারি গর্ব্ব হয়েছে। তবু তো ঘরজামাই, নইলে না জানি আরও কি হতো।"

কাঁদিয়া সে চলিয়া গেল।

জমিদারের জামাই—ঘর জামাই—সে আবার কি কথা? যতীন যেন আকাশ হইতে পড়িল,—কই, এ কথা তো সে বাড়ীতে শুনে নাই। নিশ্চয়ই কথাটা হইয়াছে নহিলে মেধা জানিতে পারিল কি করিয়া?

কথাটার মর্ম্মার্থ সে বুঝিতে পারিতেছিল না। আচ্ছা, হইলই না হয় কথাটা, কিন্তু তাই কি সম্ভব হইতে পারে? ইলার সঙ্গে তাহার বিবাহ—ছিঃ, মনে করিতে লজ্জায় সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বৎসর খানেক আগে হইলে সে এতখানি লজ্জা পাইত না, এখন বিবাহের নামে কেন যে এতখানি লজ্জা আসে তাহা সেই বুঝিতে পারে না।

বইখানা সম্মুখেই পড়িয়া রহিল, সে সম্মুখের মেঘে ঢাকা আকাশের পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল ইলার কথা। সেই ইলা—যাহাকে স্কুলের ছেলেরা সকলেই খুসী রাখিতে চায়, সেই ইলা তাহার স্ত্রী হইবে। আচ্ছা, বউদিকেও তো দাদা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, সেও তো তেমনই করিয়া ইলাকে বিবাহ করিয়া আনিবে। বউদি যেমন গৃহের কাজকর্ম্ম করিতেছেন, ইলা কি তেমনি পারিবে? নাঃ, তাহা কখনই পারিবে না। ইলা আবার খালি পায়ে হাঁটিতে পারে না, জুতা তাহার পায়ে থাকেই, সে আবার শাড়ী ভাল করিয়া পরিতে পারে না, বেশীর ভাগ তাহার গায়ে ফ্রক থাকে, কদাচিৎ দাসীর সাহায্যে এক রকম করিয়া কাপড় পরে, সেও চারিদিক পিন দিয়া আঁটিয়া,—তবে বউ হইয়া সে ঘোমটা দিবে কি করিয়া,—অথচ ঘোমটা না দিলেও তো বউ হইবার যো নাই।

এই ফ্রক পরা ও জুতা পায়ে দেওয়াটাই যতীনের মনে একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল, সে স্পষ্ট চক্ষে দেখিল, জুতা না খুলিলে এবং মাথায়

কাপড় না দিলে ইহাকে কোন রকমে মানাইবে না, বধূ হইতে গেলে এই গুলিই যে দরকার।

ইলা তাহাদের এই খড়ের ঘরে বধূরূপে পদার্পণ করিবে কি না, তাহা ভাবার বয়স তখন তাহার নয়, যেটা সহজেই ধারণাই আসে তাহাই লইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

ভাত নামাইয়া একখানা তরকারী চাপাইয়া দিয়া রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া সাবিত্রী দেখিল, যতীন ভারি অন্যমনস্কভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে বইখানা পড়িয়া রহিয়াছে।

"ও ঠাকুরপো, এই বুঝি তোমার পড়া হচ্ছে, তোমার বণিক শব্দ কি আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে যে তাই দেখছো? ওমা, আমি তাই ভাবছি, ঠাকুরপো হঠাৎ চুপ করলে কেন!"

সন্ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি বইখানা কুড়াইয়া লইয়া অধীত স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যতীন বলিল, "একটু ধর না বউদি, দেখি মুখস্থ হয়েছে কিনা।"

বউদি গম্ভীরভাবে বই লইয়া বলিল, "রূপ কর।"

যতীন রূপ করিতে করিতে ষষ্ঠির বহুবচনে শব্দ হারাইয়া ফেলিল, কিছুতেই মনে হইল না। রাগ করিয়া বইখানা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া সাবিত্রী বলিল, "নাঃ, আজ তোমার মন কোথায় বেড়াতে গেছে ঠাকুরপো, এই পড়া বলতে পারছ না?"

লজ্জিতমুখে যতীন বলিল, "আচ্ছা, ওখানা আমি এখনি ঠিক করে নিচ্ছি, তুমি আমার হিষ্ট্রিটা নাও দেখি। আকবরের রাজত্ব—বুঝেছ?"

একে একে সব বইয়ের পড়া দেওয়া হইয়া গেল, সব গুলিই সে বিশেষ প্রশংসার সহিত—মায় অর্থ সহ আবৃত্তি করিয়া গেল।

নারায়ণী উঠিয়া আসিয়া পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, বধূর পানে তাকাইয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তুমি তো বেশ ইংরাজীও জানো মা।"

সাবিত্রীর মুখখানা লজ্জার হাসিতে ভরিয়া উঠিল, মুখ নত করিয়া মৃদু-কণ্ঠে সে বলিল, "সামান্য শিখেছিলুম মা, এখন সব ভুলে গিয়েছি।"

প্রায় তাহার কথার সঙ্গে যোগ দিয়া যতীন বলিয়া উঠিল, "না মা, বউদি কিচ্ছু ভোলে নি। আমি বউদির কাছেই তো পড়া জেনে নেই. যে অঙ্কটা কঠিন হয়, দুজনে মিলে সেটা করে ফেলি। বউদি অনেক জানে মা, কিন্তু এমনভাবে থাকে যে—অন্যে জানা দূরে থাক তুমিই জানো না—বউদি এমন সুন্দর লেখাপড়া জানে।"

সাবিত্রী বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কি যে বল ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই। ওর কথা শুনবেন না মা, ঠাকুরপোর কথায় একটু সত্যি নেই।"

যতীন কি বলিতে যাইতেছিল, সাবিত্রী বাধা দিয়া বলিল, "আর বেশী বকো না ঠাকুরপো, তোমার উপক্রমণিকা মুখস্থ করে ফেল, এদিকে ইস্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে এল। মা আপনি কাপড়খানা ছেড়ে রাখুন, আমি এই তরকারীটা নামিয়েই ঘাটে যাব কেচে আনব এখন।"

সে তাড়াতাড়ি আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

নারায়ণী অপলক দৃষ্টিতে পুত্রের পানে তাকাইয়াছিলেন, মনে হইতে-ছিল যতীন যেন বড় রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল গৌর কান্তি যেন মলিন হইয়া আসিয়াছে। তিনি রবীনের ভাবনাতেই অস্থির, যতীনের দিকে তো চান না, কাজেই তাহার শরীরের প্রতি দৃষ্টি না থাকা হেতু যে এরূপ ঘটিবে, ইহা তো বিচিত্র নয়।

হায়রে, দুদিন বাদেই যে তাহাকে বিদায় দিতে হইবে, তখন—,

মায়ের মুখে বড় বিষাদের হাসি একটু ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল—তখন কে তাঁহার মত করিয়া তাহাকে দেখিবে ?

মনে পড়িল যতীনকে এখনও কোন কথা বলা হয় নাই, সে যে মাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এ কথাটার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া দরকার।

যতীনের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে তিনি সস্নেহে বলিলেন, "থাক বাবা, আর এখন পড়তে হবে না, এইবার খেয়ে নিয়ে ইস্কুলে যাও, বেলাও অনেক হয়ে গেছে। এত রোগা হয়ে গেছিস—হাড়গুলো জির জির করছে, ভাল করে খাসনে বুঝি ?"

বারাণ্ডার উপর সকালের দিকে যে রৌদ্র আসিয়া পড়িত তাহাই ছিল যতীনের স্কুলে যাওয়ার বেলা ঠিক করিবার মাপ কাঠি। বাড়ীতে ঘড়ি ছিল না, রবীন যে ক্লক আনিয়াছিল তাহা আবার লইয়া গিয়াছে। আজ আকাশ মেঘে ছাওয়া থাকায় বারাণ্ডায় রৌদ্র আসিয়া পড়ে নাই, বেলার পরিমাণও জানিতে পারা যাইতেছিল না। আন্দাজে বেলা ঠিক করিয়া লইয়া বই খাতা গুছাইতে গুছাইতে যতীন হাঁক দিল,—"বউদি, চট করে ভাত বাড়, আমি এখনি খাব।"

মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোর অনেক দিন হতে কলকাতা দেখবার খুব ইচ্ছে আছে, না রে যতীন ?"

হঠাৎ এ প্রশ্নের কারণ কি যতীন বুঝিতে না পারিয়া, বিস্ময়ভরা দুটি চোখের দৃষ্টি শুধু মায়ের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল।

নারায়ণী বলিলেন, "চুপ করে রইলি যে, কলকাতা দেখতে বুঝি তোর ইচ্ছে হয় না ?"

উৎসাহিত যতীন বলিল, "না, হয় না বই কি? এই তো সে দিনে নরুরা সব কলকাতা হতে এসেছে। উঃ কত গল্প যে নরু করলে তা আর বলব কি মা? কলকাতায় চিড়িয়াখানা আছে, সেখানে নাকি যত জীব জন্তু সব আছে। আর একটা কি আছে—মিউজিয়াম না কি তার নাম—সেখানে নাকি পৃথিবীর যত কিছু আশ্চর্য্য জিনিস—সব আছে। আর গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট—"

নারায়ণী বলিলেন, "তোর দেখতে খুব ইচ্ছে করে বোধ হয়?"

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে যতীন বলিল, "দেখার ইচ্ছে হলেই দেখতে পাওয়া যায় বুঝি? নরুদের অনেক টাকা আছে তাই তারা গিয়ে সব দেখতে পারে, আমরা অত টাকা পাব কোথায়?"

নারায়ণী বলিলেন, "কেউ যদি তোকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় রাখে—?"

ব্যগ্রকণ্ঠে যতীন বলিল, "উঃ, তা হলে তো রোজই দেখি, সত্যি—, আমার খুব ইচ্ছে করে মা কলকাতার ইস্কুলে পড়তে, এখানকার ইস্কুলে পড়তে আর ভাল লাগে না, এখানে থাকতেও আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

বালকের সরল কথায় নারায়ণী অন্তরে কত খানি ব্যথা পাইতেছিলেন তাহা বলা যায় না। তাঁহার মনে হইতেছিল, এই ছেলে—যে এখনও তাঁহার বুকের কাছে শুইতে না পাইলে সারারাত ঘুমাইতে পারে না, বড় লোকের বাড়ীতে গিয়া সেও যখন চাল শিখিবে, তখন আর কি এখানে আসিতে চাহিবে, আর কি এমন করিয়া মা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিবে?

আবার—অবাধ্য হৃদয়, আবার ওকি ভাবনা? ইহাতে যে যতীন যথার্থ মানুষ হইবে, সে যে এই দেশের জমিদার হইবে। উচ্চাশা, তুমি এসো, মায়ের স্নেহার্দ্র হৃদয় তুমিই কঠোর করিয়া তোল, আত্মমোহে অন্ধ হইয়া তিনি যেন যতীনের তরুণ হৃদয়ের আশা উৎসাহ হারাইয়া না ফেলেন।

নারায়ণী নিমেষে আপনাকে সংযত করিয়া ফেলিলেন। অতিকষ্টে হাসি টানিয়া আনিয়া, পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে তিনি বলিলেন, "তোর কলকাতায় যাওয়া বড্ড ইচ্ছে বলে শীগগীরই তোকে কলকাতায় পাঠাচ্ছি যতীন, আর দিন পাঁচ ছয় পরেই তোকে কলকাতায় যেতে হবে। বেশ থাকবি সেখানে, কত নতুন নতুন জিনিস দেখবি, আর তখন এখানে মোটেই আসতে চাইবি নে।"

সে হাসি যে বুকভাঙ্গা কান্নারই রূপান্তর মাত্র, তাহা কেহই বুঝিবে না। বুকের মধ্যে যে কান্নাটা ফেনাইয়া উঠিতেছিল, তাহা প্রকাশের পথ পাইতেছিল না, এই হাসির মধ্যে কতখানি কান্না ছিল, তাহা স্নেহময়ী জননীই জানেন।

যতীন লাফাইয়া উঠিল,—"সত্যি কথা বলছ মা, সত্যি আমায় কলকাতায় পাঠাবে?" পরমুহূর্ত্তেই মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া দমিয়া গেল, দেয়ালে ঠেস দিতে দিতে বলিল, "ইস, ওসব মিথ্যে কথা মা তোমার, আমায় তুমি দেখছো—কলকাতায় যাওয়ার নামে আমি কি করি।"

নারায়ণী বলিলেন, "নারে, সত্যি তোকে পাঠাব। ভশ্চার্যি মশাইকে দিন দেখতে বলেছি, গণেশ মামা তোকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাবেন।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া যতীন বলিল, "তারপর আমি থাকব কোথায়? নরু বললে সেখানে নাকি এতটুকু জায়গা কোথাও নেই, যেখানে মানুষ একটু দাঁড়াতে পারে। সেখানে নাকি গায়ে গায়ে বাড়ী, আর রাস্তায় কেবল গাড়ী, থাকব কোথায়?"

ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টিধারা আকাশের গা বহিয়া ধরার গায়ে নামিয়া আসিল, শুষ্ক মাটী তৃষা মিটাইয়া জল লইতে লাগিল। নারায়ণী মাটীর তৃষা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "তোর সেখানে থাকবার জায়গা হলেই তো হলো। আসল কথাটা কি জানিস—তোকে জমিদার বাবুর বাড়ীতে থাকতে হবে, তোর দাদা সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিয়ে গেছে।"

তাহা হইলে মেধার কথা মিথ্যা নয়। জমিদার বাবুর এমন কিছু মাথা ব্যথা ধরে নাই যে গ্রামে এত ছেলে থাকিতে, সেই গিয়া আরাম করিয়া দিতে পারিবে।

"হ্যাঁ মা, মেধা বলছিল যে আমার সঙ্গে ইলার নাকি বিয়ে হবে, আমি নাকি জমিদারের ঘরজামাই হব।"

বিস্মিতা নারায়ণী পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "মেধা জানলে কেমন করে?"

যতীন বলিল, "সে তো এই মাত্র বলে গেল মা। আচ্ছা মা, যদি জমিদারের বাড়ীতে যাই, তারা আবার আসতে দেবে তো?"

নারায়ণী বেদনাভরা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যখন ইস্কুলের ছুটি হবে তখন আসবি বই কি। ঘরজামাই আর কি,—ইলাকে কেবল বিয়ে করবি, তারা তোকে পড়াবে শুনাবে। তোর মায়ের যদি সামর্থ্য থাকত, তবে যা ঘটছে, তা কি ঘটতে পারতো রে?"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নে তোর বেলা হয়ে গেছে। বউমার রান্না হয়ে গেছে, যা ভাত খেয়ে নে গিয়ে। ইস্কুল হতে আসার সময় খান দুই পোষ্টকার্ড কিনে আনিস, তোর দাদাকে পত্র দিতে হবে। সে তো সেখানে গিয়ে পর্য্যন্ত একখানাও পত্র দিলে না; বিদেশ—বিভুঁই, কি জানি কি হল, কে জানে, আমার ভাঙ্গা কপালে আরও কি আছে?"

যতীন উঠিতে উঠিতে বলিল, "দাদার ঠিকানাতো নেই।"

"তাই তো," নারায়ণী নির্জ্জিবভাবে হতাশ চোখে আকাশ পানে তাকাইলেন।

তাড়া খাইয়া রাগ করিয়া মেধা যে সেই পলাইয়াছিল আর আসে নাই। কলিকাতায় যাওয়ার দিন ক্রমেই আগাইয়া আসিল, মেধা আসিল না। গ্রামের আর কোন ছেলে মেয়ের জন্য যতীনের একটুও কষ্ট হয় নাই, কেননা সকলেই প্রায় তাহার বিপক্ষ দলে। এই সব ছেলেরা ধনীপুত্র নরুর ভক্ত, নরুর আদেশে তাহারা যতীনকে অপমান করিতে ছাড়িত না, বিদ্রূপও যথেষ্ট করিত। জমিদারের ঘরজামাই হইতে যতীন যাইতেছে শুনিয়া নরু টিপ্পনী কাটিল

ঘর জামায়ের পোড়ামুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

সঙ্গে অনুগত ভক্তদল বিকটস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, ইহার পর পথে ঘাটে সব জায়গায় ছেলেদের মধ্যে ওই কথাটাই চলিতে লাগিল। প্রবীণেরা তাহাদের সতর্ক করিয়া দিলেন, কেননা একদিন এই ছেলেটাই দেশের জমিদার হইবে, তখন সে এ শোধ লইতে পারে।

মনের আনন্দ প্রকাশ করার জায়গা যতীন পাইতেছিল না। ঘর জামাইয়ের কষ্টের কল্পনা সে করিতে পারে নাই, সে যে কলিকাতায় থাকিতে পাইবে, সেখানকার ভাল স্কুলে পড়িতে পাইবে এই আনন্দেই মনটা তাহার মাতিয়াছিল। মায়ের বিষণ্ণ মুখের পানে তাকাইয়া আর কোন কথা সে বলিতে পারে নাই, বউদির কাছে প্রথম আবেগটা প্রকাশ

করিয়া ফেলিয়াই সে দেখিতে পাইয়াছিল একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া পড়িলে সূর্য্যের আলো যেমন চাপা পড়িয়া যায়, বউদির মুখের প্রসন্ন হাসিটি ও তেমনি করিয়া মিলাইয়া গেল।

এখন মেধা বাকি, মেধাকে সব কথাগুলা জানাইতে না পারিলে মনে শান্তি পাওয়া যাইতেছে না।

সে হিসাব করিয়া দেখিল, পূজার বন্ধ আসিতে এখনও দুই মাস বিলম্ব আছে, পূজার বন্ধে সে আবার আসিবে, এই দুই মাস যে সে পড়ার জন্যই কলিকাতায় থাকিবে ইহা ভাবিতেও বড় আনন্দ বোধ হয়।

তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল দাদা যখন কলিকাতায় থাকিত, তখন ছুটিতে যেদিন বাড়ী আসিত সেদিন বাড়ীটি কতটা আশা আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। মা ঘর বাহির করিতেন, পথের উপর দুইটী চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিতেন, দেখিয়া তাহার বড় ইচ্ছা হইত সেও প্রবাস হইতে বাড়ী আসার সময় মা এইরূপ গভীর স্নেহ বক্ষে ধরিয়া প্রতীক্ষা করেন।

আশ্বিন মাসে সে যখন বাড়ী আসিবে তখন মায়ের স্নেহ, বউদির ভালবাসা নূতন হইয়াই তাহার বুকে ঠেকিবে কি? বাড়ীতে অবশ্য সে যে যতীন সেই যতীনই থাকিবে, চাল দেখাইবে বাহিরে ওই সব ছেলেদের কাছে। উহাদের স্তব্ধ করিয়া দেওয়া চাই, নরুর বুকে হিংসার আগুন জ্বালাইয়া দিতে হইবেই।

কিন্তু মেধাকে সে কথা বলিয়া যাওয়া দরকার। সেদিন বেচারাকে যতীন বড় অপমান করিয়াই তাড়াইয়া দিয়াছে, এই সে কলিকাতায় যাইতেছে—আবার ক---বে ফিরিবে। মেধার প্রতি করুণায় যতীনের বুকখানা ভরিয়া উঠিল, আহা, সে বেচারা কাহার সহিতই বা খেলিবে?

তাহার সহিত খেলে বলিয়া নরুর দল মেধার উপর বড় কম অত্যাচার তো করে না, অত নির্য্যাতন সহিয়াও এই ছোট মেয়েটী অটুটভাবে তাহারই পক্ষে দাঁড়াইয়াছিল।

কলিকাতা যাওয়ার আগের দিন যতীন মেধার সহিত দেখা করিতে গেল।

মেধার মা বিজয়া বাস্তবিকই বড় উদার হৃদয়া ছিলেন, যতীনের এই সুখ সৌভাগ্যে গ্রামের মা বোনেরাও বিশেষ খুসী হইতে পারেন নাই; সকলেই সতৃষ্ণনয়নে নিজ নিজ ছেলে ভাইয়ের পানে তাকাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। প্রকাশ্যভাবে কেহ কথা কহিতে পারে নাই, কেননা এ আর কেহ নয়—স্বয়ং জমিদার বাবু পছন্দ করিয়া যতীনকে গ্রহণ করিতেছেন।

যথার্থ কথা বলিতে গেলে বিজয়া ইহাতে আন্তরিক সুখী হইয়াছিলেন। নারায়ণীকে তিনি ভক্তি করিতেন, ভাল বাসিতেন, রবীন যতীনকে তিনি নিজের সন্তানের মত দেখিতেন। বিজয়ার অযাচিত সাহায্য না পাইলে নারায়ণী দাঁড়াইতে পারিতেন না, রবীনও মানুষ হইত না।

যতীনকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় একটী স্নেহচুম্বন দিয়া বিজয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মেধার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ বুঝি বাবা? আমি তাকে কত বললুম—তোর যতীন দা চলে যাচ্ছে একবার দেখা করে আয়,—তেমনি মেয়ে কি বাবা, যদি বলি সোজা পথে চল, যাবে ঠিক উল্টো পথে; কিছুতেই গেল না, বাগানে বসে বসে পেয়ারা ধ্বংস করছে। তোমার যাওয়ায় দিন বুঝি কাল ঠিক হয়েছে বাবা?"

যতীন চঞ্চলদৃষ্টি বাগানের দিকে সঞ্চালিত করিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কাল সকালে যাব।"

"তাই যাও বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার মা তোমার জন্যেই তোমায় ছেড়ে দিলেন, তাঁর এই স্বার্থত্যাগ সার্থক হোক। সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে পত্র দিয়ো বাবা, নইলে তোমার মা কেঁদে কেটে মরবেন। দুটি ছেলে—দুটিই থাকবে দূরে, অসুখ বিশুখ হলেও—"

হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন, যতীনের বিবর্ণপ্রায় মুখখানার পানে তাকাইয়া তিনি আর কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। বালকের তরুণ আশাপূর্ণ প্রাণটা যে এ রকম কথায় বেদনায় ভরিয়া উঠিতে পারে তাহা তিনি জানিতেন, কথাটা প্রকাশ করিবেন না বলিয়া তিনিও ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু গোপন করার চেষ্টা করার জন্যই তিনি ইহা গোপন করিতে পারিলেন না, একটু ফাঁক পাইতেই সেই কথাটাই মুখে ভাসিয়া আসিল।

তাড়াতাড়ি সে কথা সামলাইয়া তিনি বলিলেন, "যাও বাবা, মেধা বাগানে আছে, তার সঙ্গে দেখা কর গিয়ে। বড় হতভাগা মেয়ে,—একটা কথা যদি শোনে— ।"

যতীন বাগানের পথ ধরিল।

বাস্তবিকই বিজয়ার শেষ কথাটা তাহার অন্তরে বেশ একটু আঘাত দিয়াছিল, এই আঘাতে অনেকগুলা কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। বিবর্ণমুখে সে ভাবিতে লাগিল, যদি তাহার মায়ের অসুখ হয়, কে তাঁহাকে দেখিবে? মা যদি খবর দেন তবে তো সে আসিতে পাইবে, যদি খবর না দেন—,

মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল।

অদূরে একটা পেয়ারা গাছের তলায় মেধা বসিয়াছিল। পেয়ারা গাছটী পুষ্করিণীর ঘাটের উপরে, জলের উপর তাহার অনেকগুলি ডাল ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে অনেকগুলি পাকা পেয়ারা ছিল। নিতান্ত কষ্টকর বলিয়াই মেধা সেগুলি পাড়িতে পারে নাই।

পিছন হইতে যতীন ডাকিল—"মেধা—"

অন্যমনস্কা মেয়েটী জলের পানে তাকাইয়া ছিল, কোলে অনেকগুলি পেয়ারা পড়িয়া ছিল। খাইবে বলিয়াই সে অনেক কষ্ট করিয়া প্রবল উৎসাহভরে পেয়ারা পাড়িয়াছিল, পাড়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল উৎসাহ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, আর একটা পেয়ারা খাইতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

যতীনের ডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিতেই কোলের পেয়ারাগুলা ছিটাইয়া পড়িল; অনেকগুলা সিঁড়ি বহিয়া গড়াইতে গড়াইতে জলের দিকে চলিল।

যতীনের পানে না তাকাইয়া সে তাড়াতাড়ি পেয়ারা কুড়াইতে লাগিল। এই ডাকটীর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না বলিয়াই চমকাইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—ছিঃ, যতীন দা কি ভাবিল—আশ্চর্য্য, তাহার হইয়াছে কি?

যতটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া লইয়া যতীন মেধাদের বাড়ী আসিয়াছিল ততটা আনন্দ আর তাহার ছিল না, সে শুষ্কস্বরে বলিল, "জানিস মেধা আমি কাল কলকাতা চলে যাচ্ছি।"

মেধা অন্যমনে পেয়ারা কুড়াইতে কুড়াইতে তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, "শুনেছি।"

যতীন তাহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, বলিল "আজ কযদিন আমাদের বাড়ী যাসনি কেনরে? আমি চলে যাচ্ছি শুনেও—"

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একটু ঝাঁজের সঙ্গে মেধা বলিল, "চলে যাচ্ছো তাতে আমার কি? তুমি বড় লোকের জামাই হতে যাচ্ছো যতীন দা—তোমারই ভাল—পরের তাতে কি?"

কথাটায় যতীন আঘাত পাইল, বলিল, "এতটা আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান তোর কবে হ'তে হয়েছে মেধা আগে তো এ রকম ছিলিনে, চিরকাল আপনার বলেই তো জোর করে এসেছিস?"

মেধা তেমনি সুরেই বলিল, "চিরকাল তো এক সমান যায় না যতীন দা, দেখছ না—এখন আমি বড় হয়েছি, আমিও সব বুঝতে পারি। তুমি যদি আমাদের আপনার হতে তা হলে কক্ষণো এমনি করে একেবারে চলে যেতে পারতে না—তা হলে—"

তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, অকস্মাৎ চোখেও কোথা হইতে খানিকটা জল ভাসিয়া আসিল, পেয়ারাগুলা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

যতীন আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়াছিল। মেধা মেয়েটী চিরকালই যেন দুজ্ঞের্য়, প্রহেলিকা বিশেষ, ইহাকে সে কখনও চিনিতে পারে নাই। সে—তিরস্কার করিলে মুখ ভার করে, মারিলে কাঁদে, তবুও সে সবই যেন তাহার উপরের আবরণ, ভিতরের নাগাল যতীন এ পর্য্যন্ত পায় নাই।

আস্তে আস্তে যতীন ফিরিল, এবার সে ভিতর দিয়া বাহির হইল না, বাগানের রাংচিতার বেড়া ডিঙ্গাইয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীতে মা শুষ্কমলিন মুখে তাহার যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। কাল ভোরেই যতীনকে রওনা হইতে হইবে, আজ তাহার সব জিনিস ঠিক করিয়া দেওয়া চাই।

যতীনের ভাঙ্গা বাক্সটা টানিতেই সাবিত্রী বাধা দিল,—"না মা, ও বাক্সটা দেবেন না, সেখানে সকলে হাসবে। বড়লোকের বাড়ীর ঝি চাকরেরাও ও রকম বাক্স টেনে ফেলে দেয়। আমার বাক্সটা বেশ ভাল—সেই বাক্সটা খালি করে দেই, ওতেই ঠাকুরপোর সব গুছিয়ে দিয়ে দিন।

নারায়ণী শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "দূর পাগলী, তা কি হয়? তোমার বাক্স আমি কেন দেব মা?"

সাবিত্রী বলিল, "আমি দিচ্ছি মা, আপনি এতে কিছু বলবেন না। এর পর—ভগবান যদি দিন দেন—আমার আবার বাক্স হবে।"

নারায়ণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যা খুসী তাই কর মা, আমি কিছু বলতে পারছিনে।"

এই ছোট টীনের বাক্সটী বধূকে তিনিই কিনিয়া দিয়াছিলেন, সাবিত্রী পিত্রালয় হইতে কিছুই আনে নাই।

ছোট বাক্সটার মধ্যে সাবিত্রী নিপুণহস্তে যতীনের কাপড় জামা কয়টী ভাঁজ করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, শূন্যনয়নে নারায়ণী তাহাই দেখিতেছিলেন।

"ওর লাটিম, এগুলো দিলে না বউমা?"

সাবিত্রী বলিল, "না মা, বড়লোকের বাড়ী, সব নিন্দে করবে, বলবে এই এক পয়সার জিনিসগুলোও দিয়েছে।"

লাল লাটিমটীর পানে তাকাইয়া একটা বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাস চাপিতে

চাপিতে নারায়ণী ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু মা এই লাটিমটা যতীন নতুন কিনেছে, বড্ড ভালবাসে, কাউকে হাত দিতে পর্য্যন্ত দেয় না।"

সাবিত্রী খেলার জিনিসগুলি পুরাণো বাক্সে তুলিতে তুলিতে বলিল, থাক না মা, ঠাকুরপো যখন আসবে, তখন নিয়ে খেলা করবে। আমি এই বাক্সটায় বন্ধ করে তুলে রেখে দিচ্ছি। বাড়ীতে তো আর কোন ছেলেপুলে নেই মা যে নষ্ট করবে? ওর জিনিস ওরই থাকবে।"

বাক্স গুছানো শেষ হইয়া গেল, সেই সময় যতীন ফিরিয়া আসিল। একবার বাক্সটার পানে তাকাইয়া সে সোজা গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, একটা কথাও বলিল না। সাবিত্রী ডাকিল—"ঠাকুরপো—"

যতীন উত্তর দিল না।

নারায়ণী উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "যতীন ও রকম মুখখানা করে এল কেন বউ মা, একটা কথাও বললে না তো?"

সাবিত্রী বলিল, "মনটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে।"

মায়ের মন! বড় ব্যাকুল হইয়া উঠে। নারায়ণী তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যতীন দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া চুপচাপ বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আছে।

উৎকণ্ঠিতা জননী ডাকিলেন—"যতীন—এখনি শুলি যে, শরীর ভাল আছে তো?"

কাল সকালে তাহাকে রওনা হইতে হইবে, আজ এমন অসময়ে তাহার বিছানায় শয়ন করা বাস্তবিকই মনের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।

যতীন উত্তর দিল না, মায়ের কথা যে তাহার কানে গিয়াছে, এমন ভাবও দেখাইল না।

মা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার ললাটে হাত দিয়া পরীক্ষা করিলেন, গা গরম কি না। সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে ডাকিলেন, "যতীন, এখন শুয়েছিস কেন বাবা, শরীর ভাল আছে তো?"

যতীন তথাপি নীরব।

মায়ের মনে এতক্ষণের পর সন্দেহ হইল, সে কাঁদিতেছে। মুখখানা সে বালিশের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়াছিল, নিঃশব্দে তাহার চোখের জল বালিশ সিক্ত করিতেছিল।

নারায়ণীর বুকের মধ্যটা মোচড় দিয়া উঠিতেছিল, তিনি অতিকষ্টে নিজের হৃদয়াবেগ সামলাইয়া পুত্রের মুখখানা দুইটী শীর্ণ হাতে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "যতীন—"

যতীন চাপাস্বরে উত্তর দিল,—"কি?"

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই অমন করছিস কেন?"

যতীন মুখখানা তুলিল,—"না মা, আমি কলকাতায় যাব না, তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না, তা হলে তোমার অসুখ বিশুখ হলে তোমায় দেখবে কে? তুমি ওদের বলে দাও মা,—আমি যাব না।"

বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া সে মায়ের কোলে মুখ লুকাইল।

না, মায়ের বুকের চাপা রোদন আর মানা মানে না, অশ্রুজল যে বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিতে চায়। ভগবান, ধৈর্য্য দাও, সান্ত্বনা দাও; এই সময়টীতে নারায়ণীকে অটুট রাখ।

চোখের জল চোখে রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নারায়ণী বলিলেন, "ওকি পাগল, এই জন্যে তুই কাঁদছিস? বোকা ছেলে কোথাকার

শান্ত হ, কাঁদিস নে। আমার অসুখ হলে কে দেখবে তাই ভেবে কাঁদছিস? এই যে অসুখ হয় তুই আমায় কয়বার দেখিস বল তো? তোর বউদি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমার জন্যে তোদের কাউকেই ভাবতে হবে না, আমায় কাউকেই দেখতে হবে না, । তোরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকিস।"

মায়ের গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, মায়ের বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া যতীন বলিল, "ওরা নাকি আর আমায় আসতে দেবে না মা?"

সেই কথা; নারায়ণীর বুকটা অতর্কিতে কাঁপিয়া উঠিল। এই কথা একদিন রবীনও বলিয়াছিল, তিনি সেদিন যতীনের ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া সে কথা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

আজও শুষ্ক হাসিয়া তিনি বলিলেন, "দূর বোকা, তা কি একটা কথা হতে পারে? তুই আসবি বই কি, ছুটি হলে এখানে আসবি, দু চার দিন থেকে ইস্কুল খুললে আবার যাবি।"

যতীন মুখ তুলিল, বলিল, "নরুরা বলছে, তারা নাকি আর আমায় আসতে দেবে না তোমার কাছে। ঘরজামাই হলে নাকি আর মা বাপের কাছে আসতে পায় না?"

নারায়ণী হাসিবার চেষ্টা করিলেন, এ চেষ্টার ফলে মুখখানাই বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র; তিনি বলিলেন, "ও সব কথার কথা। ওরা তোকে হিংসে করে কি না সেই জন্যে ও রকম বলছে, তা জানিস? যারা তোকে ভালবাসে তারা সবাই বলছে এ খুব ভাল হচ্ছে, তুই ভবিষ্যতে একটা যথার্থ মানুষ হতে পারবি। আশীর্ব্বাদ করছি বাবা—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—আমার এ ত্যাগ যেন সার্থকতা লাভ করে। আমার বুকের মধ্যে যতখানি ক্ষতিই হ'ক না, তুই যেন আমার দেওয়ার দানে

ভরে উঠতে পারিস। একদিন—দূর ভবিষ্যতে মনে করিস অতীত যে দিনটী বয়ে এনেছিল তা মায়ের কাছে যত ক্ষতিজনকই হোক না তোর ভবিষ্যতকে পূর্ণ করে দিয়ে গেছে।”

নারায়ণী মুখ ফিরাইলেন, পুত্রের মাথাটীকে একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন, “ওঠ এখন, তোর যা যা নেওয়ার ইচ্ছে হয়, দেখিয়ে দিবি চল, বউমা সব ঠিক করে গুছিয়ে দিচ্ছে।”

আর্দ্রকণ্ঠে যতীন বলিল, “কিছু চাইনে মা। আমি সেখানে খেলতে যাব না, যাতে প্রকৃত মানুষ হয়ে তোমার দুঃখ ঘুচাতে পারি, সেই জন্যে যাব। না মা, কিছু দিয়ো না, শুধু আমার বই কয়খানা দাও। তুমি শুনতে পাবে মা, আমি সেখানে খেলব না, মিথ্যে সময় নষ্ট করব না, কেবল পড়ব। আশীর্ব্বাদ কর মা, আমি যেন যথার্থ মানুষ হতে পারি, যেন তোমার দুঃখ দূর করতে পারি।”

নারায়ণী কি বলিতে গেলেন, কণ্ঠে স্বর ফুটিল না, ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার বক্তব্য ভাসাইয়া লইয়া গেল।

একে একে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে লাগিল, মাসের পর মাসও কাটিয়া যাইতে লাগিল।

যতীন যতক্ষণ ছিল নারায়ণী আর এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই পাছে সে অধীর হইয়া উঠে। বিদায় মুহূর্ত্তে মেধা ও তাহার মা আসিয়াছিলেন, যতীন বিজয়ার কাছে বিদায় লইবার সময় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল "মাসিমা, মা রইলেন আপনি মাকে দেখবেন। বউদি একা সব দিক দেখতে পারবে না, মার প্রায়ই জ্বর হচ্ছে, যাতে ওষুধ পান তাই করবেন।

বিজয়া তাঁহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "সে কথা কি তোমায় বলে দিতে হবে বাবা? দিদির ওপর আমার অধিকার আছে, আলাদা জাত বলে আমি যেমন তোমাদের ভাবিনে, তোমরাও তেমনি আমাদের ভাবনা। তোমার এতটুকু ভাবনা' করতে হবে না বাবা, তুমি যেখানে যা করতে যাচ্ছো তাই করতে যাও।"

মেধা কাছে আসে নাই, দূরে দাঁড়াইয়াছিল। যতীন তাহাকে বলিবার মত কোন কথা তখন খুঁজিয়া পায় নাই, চোখ মুছিতে মুছিতে সে কলিকাতায় যাত্রা করিল।

তাহাকে বিদায় দিয়া নারায়ণী গৃহ মধ্যে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার রুদ্ধ চোখের জল তখন আর মানা মানিতেছিল না, আজ তাঁহার মনে হইতেছিল পুত্রকে তিনি হাতে করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সেকালে মায়েরা গঙ্গাসাগরে যেমন করিয়া সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া হাহাকার করিত, তিনিও তেমনি করিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি নিজের হাতে আমার এত বড় উপযুক্ত ছেলেকে বিসর্জ্জন দিলুম বিজয়া, আমি মা নই—আমি রাক্ষসী। সেকালে শুনেছি মায়েরা গঙ্গাসাগরে গিয়ে এমনি করে সন্তান বিসর্জ্জন দিয়ে আসত, আমিও যে আজ সন্তান ভাসিয়ে দিলুম বিজয়া, ওকে যে আর ফিরে পাব না।"

বিজয়া নিজের অশ্রু চাপিয়া তাঁহার চোখের জল নিজের অঞ্চলে মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "অমন অলক্ষণের কথা বলো না দিদি, যতীন ফিরে আসবে না তো কি? সে যখন ফিরবে তখন তার পানে তাকিয়ে গর্ব্বে তোমার বুক ফুলে উঠবে, সে কথা আজ মনে করে মনকে সান্ত্বনা দাও।" সেই সন্ত্বনাই দিতে হইল, নারায়ণী চোখের জল মুছিলেন, মনের মধ্যে দিনরাত হু হু করিত, বাহিরে তিনি শান্ত ভাব দেখাইতেন।

মেধাকে তিনি ছাড়িলেন না। তাহার হাত দুখানা ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুই রোজ একটীবার করে আসিস্ মেধা, তুই এলে আমি তার কথা তবু একটু ভুলতে পারব। সে তোকে বড় ভালবাসত রে, এ গাঁয়ে তোকে ছাড়া আর কাউকেই সে পছন্দ করত না। দিনে তুই আধ ঘণ্টার জন্যে আসিস, বেশীক্ষণ তোকে থাকতে হবে না।

মায়ের ব্যথা বিজয়া অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি সকালে বিকালে দুপুরে, সব সময়েই মেধাকে পাঠাইয়া দিতেন, নিজেও অবসর পাইলেই আসিতেন।

মেধাকে সামনে বসাইয়া নারায়ণী শীর্ণ হাতখানা তাহার গায়ে মাথায় বুলাইয়া দিতেন, তাঁহার চোখ দিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িত, মেধাও অশ্রু সামলাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া বউদির কাছে ছুটিত।

অযাচিত ভাবে এই মেয়েটী সংসারের অনেক কাজ জোর করিয়া করিত। সাবিত্রী ইহাতে ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিত, মেধাকে নিবৃত্ত করিতে গেলে সে জোর করিয়া বলিত—কেন আমার খুসিমত আমি কাজ করছি, তোমার তাতে এত ব্যথা লাগছে কেন বউদি? তোমার অন্য যে কাজ আছে তাই কর গিয়ে ততক্ষণ, আমাকে তুই একখানা কাজ করতে দাও।"

সাবিত্রী কিছুতেই তাহাকে পারিয়া উঠিত না, শেষকালে সে নারায়ণীর কাছে নালিশ করিত। নারায়ণী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি মেধার মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া বলিতেন, করুক মা, ওর এতে এত আনন্দ যখন—কেন ওকে বাধা দাও, মা আমার বড় লক্ষ্মী, আহা, যদি স্বজাত হতো—

কথাটা আর শেষ করিতে পারিতেন না, চকিতে মনে পড়িত স্বজাতি হইলেই বা কি হইত? জমিদারের ঘরে এমন ভাবে পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তিনি কি মেধাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন?

তথাপি মনের আবেগ দমন করিতে পারিতেন না। মেধার সু-গোল হাতখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেন, তাহার শ্রীতে উজ্জ্বল সুগৌর

মুখখানা তুলিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিতেন, আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশগুলি নাড়াচাড়া করিতেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস আর দমন করিতে পারিতেন না, নিজের অজ্ঞাতেই বলিয়া ফেলিতেন, "বউমা, মেধাকে যদি আমার ছেলের বউ করতে পারতুম—!"

মেধার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিত, সে একটা অছিলা খুঁজিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িত।

একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ, এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ করিয়া একটা মাসও কাটিয়া গেল যতীনের পত্র আসিল না।

বিবাহের দিন ছিল শ্রাবণ মাসের শেষে। গ্রাম হইতে অনেক পরিবার কলিকাতায় জমিদার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। নারায়ণীর প্রাণটা ছটফট করিতেছিল—যদি তিনি দাসীর ন্যায় কোন পরিবারের সঙ্গেও যাইতেন, একবার চোখ ভরিয়া যতীনের পার্শ্বে নববধূকে দেখিতে পাইতেন। দাসীরূপে গেলে কে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে? সেখানে কেহই চিনিতে পারিবে না তিনিই যতীনের মা।

এতদূর ভাবিয়াও অগ্রসর হইতে নারায়ণীর সাহস হইল না, কি জানি—যদি কেহ চিনিয়া ফেলে? ছিঃ, সে বড় লজ্জার কথা যে। কাজ নাই—তাঁহার পুত্রবধূকে দেখিয়া, ভগবান্ দিন দিলে কোন দিন না কোন দিন তাহাকে দেখিতে পাইবেনই।

তিনি আশা পথ পানে চাহিয়া রহিলেন কবে জমিদারের নিমন্ত্রিত গ্রামের অধিবাসীরা ফিরিয়া আসে। যতীনের পত্র না পাইলেও তিনি গণেশের মুখে প্রতি শনিবারে তাহার সংবাদ পাইতেন। গণেশ

কলিকাতায় জমিদার বাড়ীতে বাজার সরকার ছিল। অবশ্য শনিবারে সে বাজার করিয়া দিয়া আসিত, রবিবারটা সে অনেক করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া ছুটি লইয়াছিল।

লোকটা তাহার কথায় নারায়ণীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল, যতীন যে কি সুখে আছে তাহার বর্ণনা আর ফুরায় না। সব শেষে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমিও যেমন দিদি—তার ভাবনায় তোমার ঘুম নেই, খাওয়া নেই, সে অথচ তোমায় ভাববার এতটুকু অবকাশ পায় না। পাবেই বা কোথা হতে বল—সে কি তোমার এই পাড়া গাঁ? তার পেছনে কত লোকই বা ঘুরছে, মুখের কথা একটা খসাতে না খসাতে দশজন লোক হাঁ হাঁ করে গিয়ে পড়ছে। তবু তো এখনও বিয়ে হয় নি, বিয়ে হলে শুনো সে কি রকম হয়েছে।"

মা জোর করিয়া মনকে বুঝাইলেন সে সুখে আছে। তাইতো, এখানে এই পর্ণকুটীরে শাক ভাত খাইয়াই হয় তো জীবন তাহার কাটিয়া যাইত। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, স্বার্থপরা জননীর হৃদয় তাঁহাকে দেন নাই।

বিবাহে নরুরাও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ফিরিবামাত্র নারায়ণী ভগ্ন দেহটাকে অতিকষ্টে টানিয়া লইয়া তাহাদের বাড়ী গিয়া উঠিলেন।

নরুর মা তাঁহাকে দেখিয়াই সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, দিদির নাম করতে করতে দিদি এসে পড়েছে। আমি এই সবে ভাবছিলুম রেমো ছোঁড়াকে তোমাকে ডাকতে পাঠাব, তুমি নিজেই এসেছ—অনেক কাল বাঁচবে কিন্তু দিদি।"

শুষ্ক হাসিয়া নারায়ণী বলিলেন, "না বোন, অনেক কাল আমি বাঁচতে চাই নে; ভগবানের কাছে দিনরাত মাথা খুঁড়ছি যেন শীগ্‌গীর করে যেতে পারি। মেয়ে মানুষের বেশী দিন বাঁচতে গেলে বেশী দুঃখ ভোগ করতে হয় বোন; এখন যত শীগ্‌গীর যেতে পারি ততই আমার ভাল।"

নরুর মা দেয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া পিঁড়িখানা টানিয়া আনিয়া পাতিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "সে কথা আর কেউ বললে বলতে পারে দিদি, তোমার বলা সাজে না। তোমার এক ছেলে দেড়শো টাকা মাইনের কাজ পেয়ে গেছে—যা অনেক বি, এ, এম্, এ, মাথা খুঁড়ে মরলেও পায় না; আর এক ছেলে জমিদারের জামাই হল, দুদিন বাদে তুমি জমিদারের মা হবে—ও কথা কি তোমার মানায় ভাই দিদি? মানায় আমাদের, কি হতভাগা কপালই যে নিয়ে এসেছি, ভগবানও চোখ তুলে চাইতে কৃপণতা করেন। ঝাঁটা মারি এই কপালে,—"

বলিতে বলিতে সত্যই তিনি ললাটে একটা করাঘাত করিলেন। কতখানি ক্ষোভ যে তাঁহার কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল তাহা সহজেই ধরা পড়িয়া গেল, নারায়ণী যেন কেমন সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন।

নরুর মা চকিতে নিজের মনোভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "বসো ভাই দিদি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? গরীবের বাড়ী বলে কি আর বসতেও নেই?"

ব্যথিতা নারায়ণী বলিলেন, "ও কি কথা নরুর মা? আমি কি বলছি যে বসব না, দাঁড়িয়েই চলে যাব?"

নরুর মা হাসিয়া বলিলেন, "দিদি ঠাট্টাও বুঝতে পারে না। ওগো আমি ঠাট্টা করছি, তুমি বসো, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?"

তিনি যে কি ভাবে ঠাট্টা করিতেছিলেন তাহা নারায়ণী বেশ বুঝলেও সহজেই তাঁহার কথা মানিয়া লইয়া মাটীতেই বসিয়া পড়িলেন।

ব্যস্তভাবে নরুর মা বলিলেন, "ওকি দিদি, মেঝেয় বসলে কেন?"

শান্ত হাসিয়া নারায়ণী বলিলেন, "ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে ভাই। আমাদের মাটীতেই বরাবর বসা অভ্যেস কিনা, পিঁড়ি আসনে বসতে পারি নে। যাক, বিয়ে হয়ে গেল দেখলে, বেশ ভাল ভাবে হয়েছে তো, যতীনকে বেশ খুসী দেখলে?"

নরুর মা বলিলেন, "ও বাবাঃ, খুসীর কথা আর বলো না দিদি, ছেলের মুখে হাসি আর ধরে না। আশ্চর্য্যের কথা—এই সেদিন গেছে, এর মধ্যে আমাদের যেন ভুলে গেছে এমনি ভাব দেখালে। নরু তাকে কত ডাকলে, সেদিকে মোটে কানই দিলে না, ম্যানেজার বাবুর ছেলের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। হ্যাঁ, বিয়ে বেশ ভালই হয়েছে—কিন্তু ছেলের ভাব দেখলে অবাক হয়ে যাই। ওই যে কথায় বলে না—'ঘুঁটে কুড়ানীর ছেলের নাম নরেন্দ্রনাথ, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন,' তোমার ছেলেটীরও তাই হয়েছে দিদি। রাগ করো না ভাই সত্যি কথাই বলছি, ভিক্ষে করে যে খেত, সে হঠাৎ তিন মহলা বাড়ীতে গিয়ে, মটরে উঠে মনে ভাবছে আমি কি হয়েছি। ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন ছেলে কখনও দেখিনি। তুমি মনে ভেবনা দিদি, এর পরে সে আবার তোমায় মা বলে ডাকবে। জমিদার বাবুর বউ এখন তার মা, তাঁকে মা বলে আর তোমায় মা বলতে পারবে বলে আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এই যে তুমি ছেলের খবর নিতে এই দুপুরে রোদে অসুস্থ শরীরে এতখানি হেঁটে আমার কাছে এসেছ,—তোমার ছেলে আমাদের সামনে

পেয়েও একবার জিজ্ঞাসা করতে পারলে—আমার মা কেমন আছে? দুদিনের সোহাগেই এত, তবু তো জমিদার এখনও হয়নি,—তবু তো জমিদারের ঘরজামাই। নরুরা বলে মিছে না—'ঘরজামায়ের পোড়ারমুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ!' ”

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া স্থূলকায়া নরুর মা খানিকটা হাঁপাইয়া লইলেন। যে কথাগুলা তিনি বলিলেন, তাহা এক জনের অন্তরে কতখানি বেদনার বোঝা চাপাইয়া দিল, তাহা দেখিবার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না।

নারায়ণী দুই হাতে আহত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া নতদৃষ্টে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তখনি উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, দুর্ব্বল প্রাণের আঘাত সামলাইতে খানিকটা সময় লাগিয়া গেল।

চোখে জল প্রকাশ হইবার আগেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন, অন্যায় তাঁহারই, কেননা এ কথায় বেদনা পাওয়া উচিত হয় নাই, আনন্দিত হওয়াই উচিত ছিল। সেখানে গিয়া সে কাঁদে, ছটফট করে ইহাতো তিনি চান নাই, তিনি যে তাহাকে পাঠাইয়া অবধি কেবলই মাথা খুঁড়িতেছেন—হে ভগবান, সে যেন অস্থির না হয়, সে যেন চোখের জল না ফেলে, তবে কেন তিনি এ কথায় অন্তরে বেদনা পাইলেন? এ তো ভালই, হাঁ, এই তো তাঁহার প্রার্থনার বস্তু ছিল।

কিন্তু তবু—হারে মায়ের প্রাণ, তবু বুকের কোন থান হইতে ক্ষীণস্বর একটা ধ্বনিয়া উঠিতেছে—হায়রে সন্তান, এত শীঘ্র—দুটি মাস না যাইতে এমন করিয়া ভুলিয়া গেলি, মা কেমন আছে সে খোঁজটাও লইতে তোর মনে ছিল না?

নারায়ণীকে বসাইয়া নরুর মা গৃহমধ্যে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নারায়ণী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নরুর মা বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "ও কি দিদি, এখনই চললে যে, আর একটু বসো।"

নারায়ণী বলিলেন, "না বোন, আর বসতে পারব না। বউমা বাড়ীতে একা আছে, মেধাকে আসতে বলে দিয়েছিলুম, এসেছে কি না জানতে পারিনি,— দেখি গিয়ে।"

শ্রান্ত পা দুখানা আবার শ্রান্ত দেহখানিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ভাদ্রের মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের প্রখর তেজ, সূর্য যেন পৃথিবীর গায়ের জলধারা নিঃশেষে শুষিয়া লইবার জন্য আকাশে উঠিয়াছে। পথ দিয়া চলিতে নারায়ণীর চোখ অন্ধকার হইয়া আসিল, তিনি পথের ধারে একটা গাছ তলায় বসিয়া খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইলেন।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিলেন মেধা বারাণ্ডায় বসিয়া নিবিষ্টমনে যতীনের পুরাতন পাঠ্য পুস্তক লইয়া পড়াশুনা করিতেছে। সে এখন প্রত্যহ দুপুরে এখানে আসিয়া সাবিত্রীর কাছে পড়াশুনা করিত। নারায়ণীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বইগুলা গুটাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "ইস, এত রোদে এলে কেন মাসীমা, তুমি যে বলে গেলে বিকেলে আসবে?"

বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে নারায়ণী বলিলেন, "যা জানবার জন্যে গিয়েছিলুম তা জানা হয়ে গেছে, আর সেখানে থেকে কি হবে বলে চলে এলুম। তুই কখন এসেছিস মেধা, বউমা কোথায়?"

মেধা বলিল, "আমি অনেকক্ষণ এসেছি, বউদি বাসন নিয়ে ঘাটে গেছে।"

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই রোদে এখন বাসন নিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল? না হয় বেলা একটু পড়লেই যেতো, বাসন মাজা তো পালিয়ে যাচ্ছিল না।"

রক্তবর্ণ মুখে সমস্ত অঞ্চলটা মাথায় চাপাইয়া বাসনের গোছা হাতে লইয়া সাবিত্রী এই সময় ঘাট হইতে ফিরিল। শ্বাশুড়ির কথাগুলা তাহার কানে গিয়াছিল, নিঃশব্দে সে রন্ধনগৃহের ভিতরে চলিয়া গেল।

মেধা জিজ্ঞাসা করিল, "যতীনদার বিয়ে হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, বিয়ে হয়ে গেছে, সে বেশ ভালই আছে শুনলুম।"

এ কথাটাকে তিনি এইখানেই চাপা দিতে চাহিতেছিলেন, বেশী নাড়াচাড়া করিবার সাহস তাঁহার হইতেছিল না, কি জানি—যদিই অন্তরের গোপন ব্যথাটা বাহিরে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে।

মেধা ছাড়িল না, বলিল, "যতীন দা আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি মাসীমা?"

খানিকটা হাসি নারায়ণীর মুখে ভাসিয়া আসিল, তিনি বলিলেন, "তা কি করেনি ভাবছিস মেধা? সে নাকি সকলের নাম করে জিজ্ঞাসা করেছে কে কেমন আছে? গাঁ ছেড়ে কলকাতায় অচেনা লোকের মাঝ-খানে গিয়ে তার মনটা কি রকম করছে তা সহজেই কি তুই বুঝতে পারছিস নে?"

এই জীবন্ত মিথ্যা কথাগুলি বলিতে নারায়ণীর মুখখানা যে কি রকম বিকৃত হইয়া উঠিল, তাহা মেধা দেখিয়াও বুঝিতে পারিল না। সে মাথা দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই তো বলি। মাগো মা, নরুটা কি মিথ্যেবাদী মাসীমা, কেমন বললে যতীন দা নাকি আমাদের কারও কথা জিজ্ঞাসাও

করেনি। আমি তো তাই বলি, সত্যিই কি এমনি হতে পারে, না মাসীমা ?"

বালিকার সরল কথাগুলি নারায়ণীর বুকের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিল ; তিনি উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "হ্যাঁ, তুই পড় মা, আমি খানিকটা শুয়ে পড়ি গিয়ে। এতখানি রোদে যাওয়া আসা করে দেহটার মধ্যে কি রকম করছে।"

মেধা ত্যক্ত বইগুলা আবার টানিয়া লইল।

যতীনের অবস্থা হইয়াছিল বড় শোচনীয়। সে প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন যে চিত্র মনে আঁকিয়াছিল, এখানে আসিবার পর সে সব মুছিয়া গেল, এখানে আসিয়া সে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। এ অবস্থায় পড়িয়া আনন্দ পাওয়া দূরে থাক বিষাদে দুঃখে তাহার মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহার চোখে জল আসিতেছিল। অভিমানে হৃদয় তাহার ভরিয়া উঠিতেছিল—মা জানিয়া শুনিয়া কেন তাহাকে এখানে—এই বন্দীভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য পাঠাইলেন? জীবনে কখনও সে তাহার চির পরিচিত পল্লী ছাড়িয়া বাহিরে আসে নাই, তাহার মুক্ত উদার পল্লী—তাহার কাছে কত সুন্দর, কত মনোরম! সবুজ লতায় পাতায় ছাওয়া তাহার গ্রামখানি, কি সুন্দর সেখানকার পুষ্করিণীগুলি। এখানকার সবই যেন বন্ধনের মধ্যে, স্বাধীনতা কিছুরই নাই, কোথাও একটু হাঁফ ছাড়িবার স্থান সে খুঁজিয়া পায় না। মা তাহাকে কোথায় পাঠাইলেন, কেন পাঠাইলেন? এখানে সে থাকিবে কি করিয়া,—এখানে থাকা যে তাহার পক্ষে অসহ্য।

মায়ের উপর যত রাগ হইতেছিল, ততই তাহার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছিল। নিজের হাতে কিছু করিবার যো নাই, চারিদিক হইতে রাক্ষসের মত দশটা লোক হাঁ হাঁ করিয়া আসে। সময় সময় তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সে ভাবে কাজ নাই তাহার ইহাদের

বাড়ী থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া, সে দেশের ছেলে দেশেই চলিয়া যাইবে।

গম্ভীর প্রকৃতি উমাপতি বাবুর কাছে সে একটা কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার কাছে এই কথা বলিবার উদ্দেশ্যে সে যখন দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তখন তাস খেলায় মহা ব্যস্ত; জামাতাকে চুপচাপ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?"

বেচারা নির্ব্বাকে মাথা চুলকাইতে লাগিল, কি বলিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। উমাপতি বাবু হাতের তাসের পানে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "এ সব দিকে নজর দিতে হবে না তোমার, তোমার নিজের কাজ দেখ গিয়ে। বেলা চারটে বাজল, এখনই তোমায় হাওয়া খেতে গড়ের মাঠে যেতে হবে, যাও, নতুন যে স্যুটটা এনে দিয়েছি সেইটে পরে প্রস্তুত হয়ে নাও গিয়ে।"

শুষ্কমুখে যতীন ফিরিল। দুজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া পোষাক পরাইয়া দিতে গেল, যতীন অধীর হইয়া বলিল, "আমি আজ বেড়াতে যাব না, বলে দিয়ে আয় ম্যানেজার বাবুকে। সংয়ের মত সেজে মোটরে চেপে হাওয়া খেতে যেতে আমার ভাল লাগে না, আমি চাইনে এখানে থেকে এমন জুজুবুড়ি হতে—,"

রুদ্ধ রোদনাবেগ তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, সে সটান বিছানায় শুইয়া পড়িল।

যতীনের জন্য একটী মাষ্টার সম্প্রতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ইনি দিন রাত যতীনকে কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিতেন। মণীন্দ্র বাবু যথার্থ শিক্ষিত ও কর্ম্মী ছিলেন, মানব চরিত্র বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। ধনী পরিবারের বিলাসিতা তিনি চিনিতেন, যতীনকে তাই যথার্থ মানুষ-

রূপে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কারণ একদিন এই ছেলেটীই জমিদার হইবে, অনেক লোকের শুভাশুভের দায়ী সে হইবে। তবে যতীনকে যে ভাবে পাইবার আশা তিনি করিয়াছিলেন, সে ভাবে পান নাই, কেননা উমাপতি বাবু নিজে সর্ব্বদা জামাতাকে না দেখিতে পারিলেও তাঁহার বিশ্বস্ত ম্যানেজার গৌরীকান্ত সেন ভাবী জমিদারের উপর কড়া দৃষ্টি রাখিতেন, যাহাতে সে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী জমিদার হইতে পারে, সেই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

যতীন গৌরীবাবুকে মোটেই দেখিতে পারিত না। পূরা চার হাত লম্বা, অথচ অত্যন্ত শীর্ণ এই লোকটীর পানে তাকাইতে বিরক্তিতে তাহার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিত, তাঁহার আদেশ সে শুনিতে চাহিত না, যেন শুনে নাই এমনিই ভাণ করিত।

মণিন্দ্র বাবুকে সে যথার্থ ভালবাসিত, তিনি যাহা বলিতেন তাহাই সুবোধ বালকের মত শুনিয়া যাইত, কোন দিনই তাঁহার কথার অবাধ্য হয় নাই।

অন্তঃপুরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ছিল শুধু আহারের সময়, শ্বাশুড়ীকে সে কিছুতেই মা বলিয়া ডাকিতে পারে নাই। তাহার অন্তরে যে মাতৃ-মূর্ত্তি জাগিয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায়? যতীন জানিত মা না হইলে মা বলা যায় না, মা কি যাহাকে তাহাকে বলা যায়, তাহা হইলে মায়ের সম্মান থাকে কোথায়?

বিবাহের পরই ইলাকে বোর্ডিংয়ে দেওয়া হইয়াছিল, এতটুকু মেয়ের স্বামীর কাছে থাকিতে নাই বলিয়া ইলার মা শোভনার ধারণা ছিল। ইলা সপ্তাহে একদিন বাড়ী আসিত, আবার চলিয়া যাইত।

ইলাকে যতীন বড় ভালবাসিত। স্ত্রী হইলেই যে ভালবাসিতে হয় তাহার কোন অর্থ নাই, বিবাহের পূর্ব্ব হইতে যতীন এই মেয়েটীকে ভালবাসিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল কলিকাতা বাসকালে ইলা মেধার মতই তাহার পাশে পাশে থাকিবে, কিন্তু সে আশা তাহার সফল হইল না।

ভৃত্যেরা গিয়া গৌরীবাবুকে খবর দিল, ছোটবাবু শুইয়া পড়িয়াছেন, তিনি আজ বেড়াইতে যাইবেন না; ভাবে বোধ হইল তিনি খুব রাগ করিয়াছেন।

চটিজুতার ফটর ফটর শব্দ তুলিয়া গৌরীবাবু দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যতীন বুঝিল তিনি আসিয়াছেন, তথাপি সে এদিকে তাকাইল না, যেমন দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়াছিল তেমনই শুইয়া রহিল।

দরজার পর্দ্দাটা সরাইয়া গৌরীবাবু ডাকিলেন, "যতীন,"

যতীন উত্তর দিল না।

ছেলেটা যে সর্ব্বাংশেই বদমাইস ইহাতে গৌরীবাবুর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু প্রভুর মনোরঞ্জনার্থে তিনি প্রভুর জামাতা ও ভাবি জমিদারের তোষামোদই করিতেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে মিষ্টস্বরে তিনি বলিলেন, "কি হয়েছে যতীন, এমন সময়ে শুয়ে রয়েছ যে? ওঠো, খানিকটা বেড়িয়ে আসবে চল, শরীর খারাপ থাকলেও খানিকটা বেড়ালে ভাল হয়ে যাবে।"

যতীন উঠিয়া বসিল, মাথা নাড়িয়া জানাইল সে বেড়াইতে যাইবে না।

গৌরী বাবু বলিলেন, "তা বললে কি চলে বাবা! কর্ত্তা বাবুর হুকুম রোজ বিকেলে দুই ঘণ্টা তোমায় বেড়িয়ে আনা চাই। তুমি যাওনি

শুনলে আমায় অনেক কথা বলবেন। মণিন্দ্র বাবুও আসছেন, এখন তুমি পোষাকটা পরে নাও।”

যতীন খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “আমি এখানে আর থাকব না, বাড়ীতে মার কাছে যাব।”

গৌরী বাবুর শুষ্ক শূন্য ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, তিনি নরম সুরে বলিলেন, “বাড়ীর জন্যে মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি? তা বেশ, আমি আজ কর্ত্তা বাবুকে বলব এখন।”

উত্তেজিত কণ্ঠে যতীন বলিল, “হ্যাঁ, পূজোর সময়ও বলেছিলেন না, এখনও তো তেমনি করে বলবেন? এবারে আমি কিন্তু মার কাছে যাবই, আমি কিছুতেই এখানে থাকব না। আমি বড়লোকের বাড়ী ঘরজামাই হয়ে থাকতে চাইনে—চাইনে—চাইনে—”

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার বেগতিক দেখিয়া গৌরীকান্ত বাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে বলিলেন, “আচ্ছা, আমি কর্ত্তা বাবুকে এখনিই বলছি গিয়ে, তিনি যা বলেন, তাই শুনো।”

পাঁচ মিনিট পরেই কর্ত্তাবাবুর পিয়ারের খানসামা রাখাল আসিয়া জানাইল কর্ত্তাবাবু ছোটবাবুকে এখনই একবার ডাকিতেছেন।

যতীন বুঝিল গৌরীবাবু উমাপতি বাবুর কাছে সব কথা বলিয়াছেন, তাই তিনি তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। প্রথমটা সে দমিয়া গেল, পরক্ষণেই আশার আলোকে তাহার অন্তর দীপ্ত হইয়া উঠিল। হয় তো এমনও হইতে পারে উমাপতি বাবু সব কথা শুনিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিবেন।

সে গণিয়া দেখিল যে সে এখানে পাঁচ মাস আসিয়াছে। পূজার বন্ধে বাড়ী যাওয়ার কথা, উমাপতি বাবু এমন কঠিন মুখে মাথা নাড়িয়াছিলেন যাহাতে সে আর সে প্রস্তাব মুখে আনিতে পারে নাই। পূজার বন্ধে শ্বশুরের সহিত তাহাকে পশ্চিমে যাইতে হইয়াছিল, অন্তর তাহার বেদনায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তথাপি সে আর একটিবারও যাওয়ার কথা মুখে আনিতে পারে নাই।

আনন্দে হৃদয়টা তাহার পূর্ণ হইয়া গেল, যদি সে এখন একবার দেশে যাইতে পায়। পূজার বন্ধে মা কত আশা করিয়াছিলেন, সে দেশে ফিরিবে—তাঁহার সে আশা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এখন সম্মুখে বড়দিনের বন্ধ আসিতেছে, সে এখন নিশ্চয়ই যাইতে পারিবে। একবার সেখানে যাইতে পারিলে হয়, আর কে তাহাকে লইয়া আসিতে পারে তাহা সে দেখিয়া লইবে।

মনের মধ্যে মতলব আঁটিয়া সে আবার উমাপতি বাবুর নিকট চলিল।

গৃহমধ্যে তখন উমাপতি বাবু মণিন্দ্র বাবুকে কি বলিতেছিলেন, বন্ধু বান্ধবদল তখন সকলেই চলিয়া গিয়াছে। দরজার উপর গিয়া সে দাঁড়াইতেই তাহার উপর উমাপতি বাবুর দৃষ্টি পড়িল, রুক্ষ কণ্ঠস্বরকে কতক পরিমাণে সামলাইয়া তিনি বলিলেন, "এদিকে এসো, তোমার মাষ্টারের পাশের চেয়ারখানায় বসো।"

তাঁহার রুক্ষ মুখখানার পানে তাকাইয়াই যতীনের সব সাহস লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে নতমুখে তাঁহার আদেশ পালন করিল।

তেমনই স্বরে উমাপতি বাবু বলিলেন, "দেশে যাওয়ার জন্তে তোমার এত ঝোঁক কেন, তাই আমি শুনতে চাই, দেশে তোমার কে কে আছে?"

কথাটা অত্যন্ত পুরাতন, কেননা তিনি বেশই জানিতেন দেশে তাহার মা ও বউদি ছাড়া আর কেহ নাই।

যতীন মাথা নত করিয়াই উত্তর দিল, "দেশে মা আছেন।"

উমাপতি বাবু বলিলেন, "তুমি নেহাৎ শিশু নও যে মায়ের কাছ ছেড়ে থাকলে গলা শুকিয়ে মারা যাবে। তোমার বয়স যথেষ্ট হয়েছে, এ রকম বয়সে ছেলেদের ভালমন্দ বিবেচনা করবার শক্তি যথেষ্ট হয়ে থাকে। তোমায় ভাল কথায় বলে দিচ্ছি—মাঝে মাঝে ও রকম অবাধ্য হয়ো না, ও রকম ব্যবহারের জন্য তোমায় আমি একবারই ক্ষমা করতে পারি,—বারবার করতে পারিনে। আমার কথা যদি শুনে চল ভবিষ্যতে তোমারই তাতে ভাল হবে। যাও, মণিবাবুর সঙ্গে খানিকটা বেড়িয়ে এসে পড়তে বসো গিয়ে।"

যতীন সজল চোখ নত করিয়া বাহির হইয়া আসিল, মণিবাবুও তাহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিলেন। যতীনের হাত ধরিয়া তাহার গৃহ-মধ্যে লইয়া গিয়া শান্ত স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ যতীন, বারবার সত্যই তোমার এ রকম করা উচিত নয়, সত্যই তোমার নিজের ভালমন্দ বুঝবার শক্তি হয়েছে। তুমি জানো—তুমি যেখানে এসেছ, সেখানে দয়া মায়া পাবে না, চোখের জলের বিনিময়ে পাবে—বিদ্রুপের হাসি, নিষ্ঠুর পরিহাস। নিজের ব্যক্তিত্বকে এ রকম করে পদে পদে কেন দলিত করছো, নিজেকে জাগিয়ে রাখো, খাটো হয়ো না।"

"মাষ্টার মশাই—"

যতীন আর কথা বলিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া

পড়িল, সে তাহার একমাত্র বন্ধু মণিবাবুর কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্ষুদ্র বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মণিবাবু বলিলেন, "বুঝেছি, মনে বড় আঘাত পেয়েছ? এ আঘাত তোমার নিজের হাতে টেনে আনা যতীন, ইচ্ছে করলে, এ আঘাত হতে তুমি বাঁচতে পারতে। আত্মবোধশক্তি যার নেই, তাকেই যে পদে পদে এমনি অশেষ আঘাত পেতে হয়—এ শুধু একদিন নয় যতীন,—তোমায় অনেক দিনই বলেছি। নেহাৎ বালক তুমি, তাই আমার কথা শুনেও বুঝতে পার না, মনের অবস্থা মুখে ব্যক্ত করে ফেল। ওঠ, মুখ তোল, আমার কথা শোন।"

যতীন মুখ মুছিয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এরা তবে আমায় আর সেখানে যেতে দেবে না মাষ্টার মশাই?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা চাপা দিবার চেষ্টা করিতে করিতে মণিবাবু বলিলেন, "একরকম তাই বটে। তুমি বোধ হয় জান না, এঁরা কি ভাবে তোমায় গ্রহণ করেছেন। বড়লোকের ঘরজামাই, ভবিষ্যৎ জমিদার হওয়ার বিনিময়ে তুমি তোমার সকল স্বাধীনতা হারিয়েছ। এখন তোমার অভি-ভাবক তোমার শ্বশুর উমাপতি বাবু, তোমার মা নন, তাই এঁর বিনা অনুমতিতে তুমি এই বাড়ী ছেড়ে এক পাও নড়তে পারবে না।"

যতীনের বুক ফাটিয়া আবার কান্না আসিতেছিল, সে বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "এঁরা না বললে আমার মাকে, বউদিকে, কাউকে দেখতে পাব না?"

মণিবাবু মলিন হাসিয়া বলিলেন, "সেইটুকুই তো আশ্চর্য্য দেখছি। জানিনে এঁরা কি সর্ত্তে তোমায় তোমার মার কাছ হতে নিয়েছেন। যে

রকম ভাব দেখাচ্ছেন তাতে আমার মনে হচ্ছে, এঁরা তোমায় যেন কিনেই নিয়েছেন, অন্ততঃ পক্ষে যতদিন তুমি নাবালক থাকবে ততদিন এঁরা আইনের বলেও তোমায় রাখতে পারবেন, অবশ্য যদি তোমার মায়ের সঙ্গে সে রকম লেখাপড়া হয়ে থাকে।"

মা—মাকি তাহাকে এমনই সর্ত্তে দিয়াছেন যে—

যতীন সজল নেত্রে বলিল, "না মাষ্টার মশাই, মা তো আমায় কোন সর্ত্ত করে দেন নি। তিনি বলেছিলেন আমি ভবিষ্যতে জমিদার হতে পারব বলেই তিনি আমায় দান করেছেন।

মণিবাবু বলিলেন, "গোঁড়াতেই স্বার্থের সর্ত্ত রয়েছে যে ভাই। তিনি নিজের বুকে ক্ষতির বোঝা নিয়ে তোমার মস্ত লাভ করিয়ে দিয়েছেন, মা যে সন্তানের শুভের জন্যেই সন্তান ত্যাগও করতে পারে—মায়ের সেই মহামূর্ত্তির বিকাশ করেছেন। বোকা ছেলে, তোমার চেয়ে তিনি যে বেশী কষ্ট পাচ্ছেন, সেটা ভেবে দেখেছ কি? তোমায় তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন, নিজেকে একেবারে নিঃস্বা করে, তিনি নিজের পানে চাননি, তোমার পানেই চেয়েছেন। তিনি জেনে শুনেই দিয়েছেন, তাঁর ছেলে আর তাঁর কাছে স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত ফিরতে পারবে না।"

যতীন দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মণিবাবু ডাকিলেন—"ওঠ যতীন, চল।"

যতীন মুখ তুলিল, "হ্যাঁ, চলুন। একটা কথা বলুন মাষ্টার মশাই, আমি স্বাধীন হলে মার কাছে যেতে পাব তো? আমি কবে স্বাধীন হব?"

মণিবাবু হাসিলেন, "পাগল, স্বাধীন পরাধীন কথা বুঝতে পেরেছ

দেখে যথার্থই খুসি হয়েছি। আর পাঁচ ছয় বছর তোমায় এমনিই থাকতে হবে যতীন, তার পরে ভগবানের ইচ্ছায় যদি তুমি মানুষ হয়ে উঠতে পার নিজেই স্বাধীনতা বোধ করতে পারবে, তখন আর এই অধীনতার নাগ-পাশে বদ্ধ হয়ে থাকতে তোমার প্রাণ চাইবে না।"

যতীন উঠিল। পোষাক পরিতে ভৃত্যদের সাহায্য সে লইল না, নিজেই পোষাক পরিয়া লইল। মণিবাবু তাহার মাথায় হ্যাটটা বসাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "যতদিন না সেদিন আসে যতীন, ততদিন ওদের আদেশেই তোমায় চলতে হবে। ওদের আদেশে খেতে হবে, পরতে হবে, চলতে হবে, না বললে চলবে না। তবে তোমার মনে তুমি আত্মবোধ জ্ঞানটা জাগিয়ে রেখো, কারণ মন তোমার বদ্ধ পরাধীন নয়, সে চিরমুক্ত স্বাধীন। দেহ তোমার খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে পারে, মন যেন আবদ্ধ হয় না, সেই টুকুই দেখো। এদের মাঝখানে থেকেই তোমার নিজের স্বাতন্ত্র্য সাবধানে রক্ষা করতে হবে, যারা আঘাত করতে পারে, তারা যেন আঘাত না করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। একদিন এমন দিন আসবে, যেদিন তুমি ফিরে তোমার স্বাধীনকুটীরে যেতে পারবে—যদি মন তোমার স্বাধীন থাকে। আর যদি বদ্ধ হয়ে পড়ে—সেদিন তোমায় ছেড়ে দিলেও তুমি উড়তে পারবে না। এ ভাব সহজেই বুঝতে পারবে, ভগবান না করুন—যদি আঘাতের বেদনা আর তোমার বুকে না বাজে, বুঝবে সেই দিন তুমি বদ্ধ হয়ে গেছ। এসো এখন, শোফার মোটরের হর্ণ দিচ্ছে, দেরী হলে বড় বাবু আবার কি বলবেন।"

যতীনের হাত ধরিয়া তিনি বাহির হইলেন।

মাসের পর মাসও চলিয়া যাইতে লাগিল যতীন আর আসিল না। পূজার ছুটি আসিল, চলিয়া গেল, বড়দিনের বন্ধ আসিল, গেল, গ্রীষ্মের বন্ধও ফুরাইল যতীন আসিল না।

যতীনকে জমিদার বাবু যে এমন করিয়া নিজেদের করিয়া লইবেন তাহা নারায়ণী আগে ভাবেন নাই। ঘরজামাই হইলেই তাহার যে মা ভাই বোনের সহিত সকল সম্পর্ক উঠিয়া যায়, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার পিত্রালয়ে রাধাকুমুদ বাবু ঘরজামাই ছিলেন, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই দেশে যাইতে পারিতেন, কই, তাঁহাকে তো এমন করিয়া কেহই আটক করে নাই, তবে তাঁহার যতীনকেই বা ইঁহারা এমন করিয়া আটক করিল কেন, গ্রামের জমিদার বলিয়াই কি? প্রজার উপর তাঁহার অধিকার আছে বলিয়াই কি তিনি যতীনকে এমন করিয়া আটক করিয়াছেন?

সেখানে গিয়াই যতীন দু তিন খানা পত্র দিয়াছিল। ম্যানেজার বাবু নিজে তাহার পত্রাদি হাতে লইয়া পোষ্ট করিয়া দিতেন, নিয়মানুসারে যতীনের নামীয় যত পত্র যাইত, তাঁহার হাতে গিয়া পড়িত। যতীন যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিল তাহাতে সাহস করিয়া কিছুই লিখিতে পারে নাই, সামান্য দুটি চারটি কথা লিখিত মাত্র। নিজে যে কি অবস্থায় রহিয়াছে তাহা মায়ের কাছে একটীবার জানাইবার জন্য তাহার অন্তর

অধীর হইয়া উঠিত। মা কেন তাহাকে বড়লোকের ঘরজামাই করিয়া দিলেন, তিনি যদি যতীনকে না দিতেন তাহা হইলে তো যতীনকে এতটা কষ্ট পাইতে হইত না। অভিমানে যতীনের সারা বুকখানা ভরিয়া যাইত, অনেক শক্ত কথা তাহার মনে ভাসিয়া আসিত, লিখিবার সময় সে সব কথা সে প্রকাশ করিতে পারিত না।

মণিবাবুর মুখে যেদিন সে শুনিয়াছিল, তাহার স্বাধীনতা নাই, সেই দিন হইতে মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান করিয়াই সে তাঁহাকে পত্র লেখা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ব্যাকুলা নারায়ণী কত পত্র দিলেন, সব পত্র আসিয়া তাহার রাইটিং টেবলের উপর জমা হইতে লাগিল, দারুণ অভিমানে সে পত্রের পানে ফিরিয়াও চাহিত না।

উৎকণ্ঠিতা নারায়ণী ভাবিতেন, হয় তো পড়ার চাপে সে সময় পায় না বলিয়াই পত্র দিতে পারে না। পুত্রের সংবাদ পাইতে গেলে নরুদের বাড়ী যাইতে হয়, কিন্তু নরুর মায়ের কথা শুনিয়া যাইবার আর প্রবৃত্তি হয় না। গণেশ পূর্ব্বে জমিদার বাড়ী বাজার সরকার ছিলেন, হঠাৎ একদিন তাঁহার চুরি ধরিতে পারিয়া উমাপতি বাবু জন্মের মতই সে বাড়ী হইতে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন। গণেশ এখন চিনিপটীতে দালালি করেন, বাড়ী আসা প্রায় তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন।

গ্রীষ্মের বন্ধে বিদেশের সব লোক দেশে আসিল আম খাইবার জন্য, সেই সময় গণেশও দেশের আমের লোভ সামলাইতে না পারিয়া দেশে পদার্পণ করিলেন। গণেশ আসিয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র নারায়ণী তাহার কাছে ছুটিলেন।

গণেশের চেহারা আগের চেয়ে এখন একটু ভাল হইয়াছে, সেটা

বয়সের জন্য কি পয়সার জন্য তাহা বলা যায় না। তিনি তখন বারাণ্ডায় বসিয়া একটা কড়ি বাঁধা থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন, নারায়ণীকে দেখিয়া স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন, "এই যে মা এসেছ। বসো, সব ভাল তো? চেহারা বড় খারাপ দেখছি, আর কি অসুখ বিশুক হয়েছিল? নাত বউ এখানে আছে না বাপের বাড়ী গেছে?"

নারায়ণী বসিতে বসিতে বলিলেন, "আর শরীর মামা, মরণ হলেও বাঁচি। পোড়া যম এত লোককে নেয় আমায় কেন নেয় না আমি তাই ভাবি। জ্বর প্রায় আছেই, ও যেন পোষা জ্বর হয়ে গেছে। বউমা এখানেই আছে, তারও প্রায় নিত্যি জ্বর হচ্ছে। আবার এই সামনে বর্ষা, নিজের জন্যে ভাবিনে, বউমাকে নিয়ে যে কি করব তাই ভাবছি। পরের মেয়ে, বাপের বাড়ী যাওয়ার কথা বললেও যেতে চায় না।"

হুঁকাটা নামাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিতে রাখিতে মাথা দুলাইয়া গণেশ বলিলেন, "তাই তো, বড়ই মুস্কিল যে। সেদিন নাত বউয়ের বাপের সঙ্গে দেখা হল, তিনি কত কথাই না শুনিয়ে দিলেন। নেহাৎ ভদ্রলোক বলেই কিছু বললুম না, না হলে আমার হাত হতে বড় সহজে তিনি নিস্তার পেতেন না।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

নারায়ণী বলিলেন, "যতীন কেমন আছে মামা, সেই খবরটা জানবার জন্যে, তুমি এসেছ শুনেই ছুটে এসেছি। অনেক কাল—সেই পূজোর পর হতে সে আর পত্র দেয় না, এত পত্র দিলুম, একখানারও উত্তর নেই। মনটা যে কি রকম হয়েছে মামা, তা আর বলতে পারিনে। গাঁয়ে আর কার কাছে জিজ্ঞাসা করি বল, যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই মুখ টিপে হাসে,

বলে—বেশ আছে গো, খুব হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের কথা শুনে আমার মন মানতে চায় না, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি মামা, জানি তুমি যা বলবে তা সবই সত্যি হবে, ওদের মত দশটা বাড়িয়ে কমিয়ে তো বলবে না!"

নিজের প্রশংসায় গণেশ মামার বুকটা যে ফুলিয়া উঠিল ইহা বলাই বাহুল্য। তিনি পাকা গোঁফে একবার হাতটা বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিকই বলেছ মা, গাঁয়ের লোকগুলো অমনি ধরণেরই বটে, হাজার শিক্ষাই পাক তবু এদের ওদোষগুলি যাবে না। ওই যে মিত্তিরদের নগেশ ছোঁড়াটা, এতটা লেখাপড়া শিখেও গাঁয়ের স্বভাব ছাড়তে পারেনি, তাই তো বলি মা, ওটা শিক্ষাতেও যায় না, মন ভাল হলেই হয়।"

নারায়ণী বলিলেন, "সে কথা সত্যি মামা। যতীনের এই বিয়েটায় সত্যি তুমি যতটা আনন্দ পেয়েছ এত আর কেউ পায়নি। সে যে জমিদারের জামাই হয়েছে এই হিংসেয় সবার বুক ফেটে যাচ্ছে কিনা তাই যার যা খুসি সে তাই বলে যাচ্ছে। ওসব কথা এখন থাক মামা, সত্যি সে কেমন আছে সেই কথাটা আমায় একবার বল। সেখানে সবাই তাকে যত্ন করে, ভালবাসে, সে বেশ লেখাপড়া করছে?"

চুরিটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত গণেশ উমাপতি বাবুকে মোটেই পছন্দ করিত না। জমিদার সরকারে কাজ করায় তাঁহার বিনাকষ্টে বাঁধা বেতন ছাড়া দুপয়সা উপরি আয়ও ছিল, লোকের কাছে প্রতিপত্তিও ছিল। এখন তাঁহাকে কষ্ট করিতে হয় খুব, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করিয়া কলিকাতার পথে পথে ছুটাছুটি করিতে হয়, অথচ বাঁধা আয় নাই ইহাতে, রাগ হইবারই কথা। চাকরী যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর দেশে আসেন নাই।

ভাবিয়াছিলেন এ কথাটা হয় তো দেশ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং দেশময় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। নিজেকে তিনি কখনই নীচু বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই, পরের কাছেও তেমনি উঁচু চালে বলিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, কলিকাতায় জমিদার বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে চুণোপুঁটির মতই জ্ঞান করিতেন, তাঁহাকে মোটা রুই কাতলা ভাবিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তাঁহার চুরি ও কর্ম্মচ্যুতি ব্যাপারটা প্রকাশ হয় নাই, কেননা জমিদারের বাড়ীর এ ব্যাপার নিত্যকার বলিলেও চলে।

একটু উষ্ণভাবে গণেশ বলিলেন, "আরে রামোঃ, লেখাপড়া শিখেছে না ছাই করেছে, খালি বড়লোকের চালটাই শিখেছে। তোমায় পত্র দেবার তার অবকাশই বা কোথায়, তার মা, দেশ বলে যে কিছু আছে, তা সে একেবারেই ভুলে গেছে। সে কি আর সে ছেলে আছে মা, একেবারে বদলে গেছে, এখন দেখলে আর চিনতে পারবে না। কেন যে ওখানে দিলে ছেলেকে, নিজের ছেলেকে এমন করেও হারালে বাছা?"

বুকের মধ্যে একটা গোলা গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল, সেটা কখন আসিয়া গলার মধ্যে বাধিয়া গেল, সামলাইতে নারায়ণীর অনেকটা সময় লাগিয়া গেল।

অতিকষ্টে ক্ষীণস্বরে নারায়ণী বলিলেন, "কিন্তু তখন তো তোমরাই বলেছিলে মামা—।"

গণেশ বলিলেন, "আমরা বললুম বলেই তুমি দিলে কেন? পরের চাকর আমরা, যার খাই তার কাজ করতেই হবে;—তা বলে তোমার কি বিবেচনা করা উচিত ছিল না মা? যাক গিয়ে, ওতে এমন কিছু

ক্ষতি হবে না তবে ছেলেটা তোমার হয়েও রইল না, যথার্থ মানুষ হতে পারলে না এই যা দুঃখ রইল। কতকগুলো চালই শিখে যাচ্ছে, আর কিছুই শিখতে পারলে না। আস্তাকুড়ের এঁটো পাতা স্বর্গে গিয়ে মনে করেছে সেও নমস্য হয়ে গেছে, তার জন্ম যে এই মাটীর কোলেই সে তা ভাবতে ভুলে গেছে। দুঃখ করো না মা, তোমার ছেলে ভালই আছে, তবে ওই গুলোতেই তার মাথা খেয়েছে।"

নারায়ণী গুম হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

"উঠলে মা?"

নারায়ণী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন; "এখন আসি মামা, যার জন্যে এসেছিলুম তা শোনা হয়েছে।"

ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

(১৩

আবার নীল আকাশের গায়ে বর্ষার কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। হু হু করিয়া কাঁপিয়া নারায়ণীর জ্বর আসিল, তিনি গায়ের উপর মোটা কাঁথাখানা চাপাইয়া জলসিক্ত গৃহের মেঝেয় মাতুরের উপর পড়িয়া রহিলেন।

বড় জ্বর গত বৎসর বর্ষার সময় হইয়াছিল, তাহার পর যে জ্বর হইত তাহা সামান্য পরিমাণেই হইত। বেশী বাড়িত না, দিনও কম লইত। এবার বর্ষা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণীর যে প্রবল জ্বর আসিল তাহা ছাড়িবার সহজ লক্ষণ দেখা গেল না।

রবীন মাসে মাসে নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠাইত, মায়ের নামে সাত দিন অন্তর তাহার পত্র নিয়মিত ভাবেই আসিয়া পৌঁছাইত। সংসারে অর্থাভাব আর ছিল না, মনের কষ্ট দিন দিন বাড়িতেছিল বই কমিতেছিল না।

সকাল বেলায় জ্বরটা তখন ছাড়িয়া গিয়াছিল, নিতান্ত নির্জ্জিবভাবে নারায়ণী বারাণ্ডার একধারে বসিয়াছিলেন। কয়টা দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর আজ আকাশটা ধরিয়া গিয়াছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি দিতেছে, শুভ্র সূর্য্যালোকে পৃথিবীর গাত্র কখনও ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে, কখনও মেঘের ছায়ায় অন্ধকার হইয়া যাইতেছে।

মেধা উঠানে পা দিয়াই বলিয়া উঠিল, "কেমন আছ মাসীমা, জ্বর ছেড়েছে তো?"

কয়টা দিন এই মেয়েটী নারায়ণীর কি সেবাই না করিয়াছে। রাত্রেও সে বাড়ী যায় নাই, কেননা সাবিত্রীও কয়টা দিন জ্বরে বেহুঁস পড়িয়াছিল। সে কাল পথ্য করিয়াছে, নারায়ণীর জ্বরটা কাল বৈকালে ছাড়িয়া গিয়াছে। এ কয়টা দিন তাঁহার মোটে জ্ঞান ছিল না, কে তাঁহার সেবা করিতেছে, সে মেধা না সাবিত্রী। বউমা বলিয়া তিনি মেধারই হাত চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাহার মুখখানাই বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছেন। মেধা যতবার ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, যত জানাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সে সাবিত্রী নয় সে মেধা, তিনি জ্বরের ঝোঁকে ততই তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিয়াছেন—না, তুই মেধা নোস, সাবিত্রী নোস, তুই আমার বউমা, আমার যতীনের বউ।"

কথাটা কানে আসিতে মেধার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, নির্জ্জিবের মতই নারায়ণীর বুকের উপর পড়িয়াছিল।

কাল সকাল বেলায় বিজয়া নিজের দাসীকে বসাইয়া রাখিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, আর সে আসিতে পায় নাই, আজ সকাল হইতেই সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

তাহার হাসিমাখা সুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়া নারায়ণীর মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মেধাকে পাশে টানিয়া বসাইয়া তাহার সুগোল সুন্দর হাতখানা টানিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, কাল বিকেলে জ্বর ছেড়েছে। চোখ চেয়ে তোমায়

তো কাল আমার পাশে দেখতে পেলুম না, তোমার ঝিকে দেখতে পেলুম। কাল সকালে চলে গিয়েছিলে, আর সারাদিন কি একটীবার আসতে নেই মা ?

মেধা আরক্ত মুখখানা নত করিয়া ফেলিয়া বলিল, "কাল অনেক লোক আমাদের বাড়ী খেলে কিনা মাসীমা, সেই জন্যে আসবার সময় পাই নি। তোমার কাপড় ছাড়া হয়েছে মাসীমা ? দাও না, আমি কেচে এনে দেই আর বাইরের জলটা তুলে দেই। বউদিরও তো শরীর ভারি খারাপ, কাল সবে ভাত খেয়েছে, বেশী কাজ পেরে উঠবে না, তা হ'লে আবার জ্বর হবে।"

নারায়ণী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বউ মা কাপড় নিয়ে গেছে মা, বাইরের জলও তার সব তোলা হয়ে গেছে, খালি ঘরের জল তুলতে বাকি আছে। সে ঘাট হতে বাসন কখানা মেজে এসে সব জল তুলে ফেলবে এখন, তোমায় সে জন্যে কিছু ভাবতে হবে না মা লক্ষ্মী। তুমি বরং আমার মাথা কপালটায় একটু তোমার নরম হাতখানা বুলিয়ে দাও, তোমার হাত পড়লে আমার মাথা বুকের সব যন্ত্রণা যেন জুড়িয়ে যায় মা।"

মেধা তাঁহার কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, নারায়ণী দেয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন।

এমনি সময়ে সাবিত্রী ঘাট হইতে ফিরিল, তাহার কক্ষে একটা কলসী, কয়েকখানা বাসন অপর হাতে, কাচা কাপড়খানা স্কন্ধের উপর ঝুলিতেছিল। সাত আট দিন সে খুব জ্বরে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এই কলসীটি আনিতে সে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল।

মেধা কলসীটা ধরিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছিল, নারায়ণী সন্ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ছুঁয়ো না মেধা, ওটা ঘরের জল, বাইরের নয়।"

মেধা অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিল, তখনি তাহার মনে পড়িয়া গেল সে ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ নয় এমন কি গোপ জাতীয়াও নয়, সে সুবর্ণবণিককন্যা, তাহার জল ইঁহাদের ঘরে চলে না।

ধিক্কারে তাহার অন্তরটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল, ছিঃ, প্রতিপদে আঘাত পাইয়াও কেন সে ফিরে না, কেন সে জানিয়া শুনিয়া আঘাত লইতে অগ্রসর হয়? অন্তরে সে কোন অংশেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ কন্যা হইতে ন্যূন নহে, কার্য্যে সে অনেক ব্রাহ্মণ কন্যা হইতেও শ্রেষ্ঠা হইতে পারে, কিন্তু তবু এ কি ব্যবধান, একি শুচিতা।

অন্তর বেদনায় ভরিয়া গেল, এত কাছে,—বুকের উপর থাকিয়াও সে কাহারও নাগাল পায় না কেন? সে দেখিয়াছে নারায়ণী যদি তাহাকে স্পর্শ করেন, তাহাকে গোপন করিয়া পরে কাপড় ছাড়িয়া ফেলেন। গ্রামের শুচিতার ভয়ে বিজয়া তফাৎ তফাৎ থাকিতেন, মেয়েটীকেও সকলের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়াছিলেন, কেবল এইখানেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

গম্ভীরভাবে মুখের উপর হাত রাখিয়া মেধা দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া নারায়ণী তাহার হাতখানা ধরিয়া নিজের কোলের মধ্যে তাহাকে টানিয়া লইলেন, তাহার অবিন্যস্ত চুলগুলো সাজাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তোকে কলসীটা ছুঁতে মানা করলুম বলে কি দুঃখ হল মা? বোকা মেয়ে, কতদিন কতবার তোকে বুঝাবরে তোদের ছোঁয়া জল আমরা খেতে পারি নে, ওতে আমাদের জাত যায়?"

মেধা হাত দুখানা মুখের উপর চাপা দিয়া বলিল, "আগে বুঝিয়ে দাও মাসীমা, জাত জিনিসটা কি তারপর জাত যাওয়া থাকা ভেবে দেখব।"

নারায়ণী হাসিলেন,—"দূর বোকা মেয়ে, জাত, সে আবার জাত ছাড়া কি হতে পারে? জাত জিনিসটা যে কি, তা বুঝানো যায় কখনও?"

মেধা জোর করিয়া বলিল, "কেন বোঝানো যাবে না মাসীমা? আমি বলছি শোনো—আমি যেমন শুনেছি তাই বলছি—জাত বলে পদার্থ কিছু নেই। দেখ পাঁচজন লোক একই জায়গায় বসে আছে, যতক্ষণ তারা না জানতে পারে কে বামন, কে চাঁড়াল, কে মুসলমান, ততক্ষণ কেমন সম্প্রীতিতে বসে গল্প করে; যেই জানতে পারে অমনি সব তফাৎ হয়ে যায়, বামন আগে তফাৎ হয়ে বসে। তা হলেই দেখ মাসীমা, জাতটা কি মানুষেরই সৃষ্টি নয়, ওর মধ্যে পদার্থ কিছু আছে কিনা তুমি ভেবে দেখ।"

মেধাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া জলভরা চোখে নারায়ণী বলিলেন, "সত্যি জ্ঞান পেয়েছিস মেধা, কিন্তু এজ্ঞান কি তোর সার্থকতা লাভ করবে মা? এই ভেদজ্ঞান ভুলে গিয়ে মিশতে পারবি তুই অন্ত্যজের সঙ্গে, তা বলে বামন কায়স্থের সঙ্গে কি মিলতে পারবি? পারবিনে মা, ওখানে ওই জাতের বেড়া ওরাই তুলে দিয়ে সকলের কাছ হতে তফাৎ হয়ে বসে আছে, যেন কেউ ওদের নাগাল পেতে না পারে। যা বলেছিস সবই সত্যি, মানুষ আমি, আচারে বিচারে বাহ্যিক আড়ম্বরকে বজায় রাখছি, কিন্তু মনে তো জানতে পারছি মা, এ সবই মিথ্যে, এ শুধু খোলস মাত্র। সমাজ যদি এমন করে চোখ রাঙিয়ে না থাকত মেধা, তা হলে আজ আমি যে তোকেই ঘরে আনতে পারতুম মা, এমন করে কোলের সন্তান হারিয়ে

হা-হা করে তো বেড়াতে হতো না, আমার যা, তা আমার ঘরেই থাকত যে।"

ধীরে ধীরে চোখ দুইটী তাহার জলপূর্ণ হইয়া উঠিল, গভীর আবেগে মেধাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তিনি নির্ব্বাকে বসিয়া রহিলেন।

"তুই এত সকালেই এখানে এসে জুটেছিস মেধা? না, তোর জ্বালায় আর আমি পারিনে বাপু, আমার যেন মাথা ভেঙ্গে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোকে না বারবার করে বলে দিয়েছি আজ বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরুস নে, ঘাটে যাওয়ার নাম করে পেছন দিককার দরজা দিয়ে তবু তুই পালিয়ে এসেছিস?"

তাড়াতাড়ি মেধাকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া গোপনে চোখের জল মুছিয়া মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই, ওকে আজ বেরুতে দেবে না, এর মানে কি?"

বিজয়া বারাণ্ডার ধারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আজ যে ওর বিয়ে দিদি, কাল গায়ে হলুদ হয়ে গেছে।"

মেধার বিবাহ,—কে জানে কেন, নারায়ণীর বুকের ভিতরটা ধ্বক করিয়া উঠিল, মুখখানা অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। তখনই নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন, "ওমা, আগে এ খবরটা তো জানাওনি ভাই?"

ললাটে করাঘাত করিয়া বিজয়া বলিলেন, "আ আমার পোড়াকপাল, জানাব কাকে? তুমি তো কদিনই বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিলে দিদি, হাজার কথা বললেও সাড়া দিতে না, খালি যতীনের নাম করে কি বকতে। কাল মেধাকে নিয়ে গেলুম, আজ বেরুতে নিষেধ করেছি, ঠিক চলে

এসেছে। তারা আজ পাঁচ দিন হল দেখতে এসেই আশীর্ব্বাদ করে গেছে, হঠাৎ বিয়ে হচ্ছে দিদি। আশীর্ব্বাদ কর ভালয় ভালয় যেন বিয়েটা হয়ে যায় আর মেধা যেন সুখী হয়।"

স্নেহভরে মেধার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নারায়ণী বলিলেন, "সে আশীর্ব্বাদ কি একবার করে করছি বোন, দিনে লক্ষবার আশীর্ব্বাদ করছি মেধার যেন ভাল হয়, ভগবান যেন ওকে সুখী করেন। কোথায় বিয়ে হচ্ছে, ছেলেটী কেমন ?"

বিজয়া বলিলেন, "ছেলেটী বড় ভাল দিদি, তার আর কেউ নেই। কোন অফিসে কাজ করে, দেড়শো টাকা মাইনে পায়, এদিকে তাদের দেশ মুর্শিদাবাদেও অনেক জমিজমা আছে, তাতে আয় বিস্তর। ছেলেটী কলকাতায় থাকে, মাঝে মাঝে দেশে যাওয়া আসা করে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে—আমার ওই একটীমাত্র মেয়ে, সুখে থাকে দেখে যেন মরতে পারি।"

বলিতে বলিতে বিজয়া নারায়ণীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন, কন্যার পানে তাকাইয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি, দিদির পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দে। মেয়ে যেন কাঠের পুতুল, বিয়ের নাম শুনে মেয়েরা কত খুসি হয়ে ওঠে, এ মেয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখের সে হাসিখুসি কোথায় মিলিয়ে গেছে, স্ফূর্ত্তি নেই, যেন আমরা ওকে ধরে বলিদান দিতে যাচ্ছি এমনই ভাবখানা। বল দেখি দিদি, চৌদ্দ বছর যার বয়েস হল সে কি—"

মেধাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নারায়ণী বলিলেন, "কিছু দোষ ওর নেই ভাই, আনন্দ যদি না আসে জোর করে কি আনা

যায়? ওর অন্তরের কোথাও বুঝি ব্যথা লেগেছে বিজয়া, সে ব্যথার ওপর আরও ব্যথার বোঝা চাপিয়ো না, সে ব্যথায় সান্ত্বনা দিয়ে যাতে ও আবার হাসতে পারে তাই করো। সকলেই কি সমান হয় বোন? কেউ বা বিয়ের নাম শুনে আনন্দে ভরে ওঠে, কেউ বা বাপ মা আত্মীয় স্বজন ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কাঁদতে বসে। সবাই সমান হয় না, কারও মায়া কম হয়, কারও বেশী হয়, যাদের বেশী হয়, দুর্দ্দশা হয় তাদেরই।"

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া মেধা হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। রন্ধনগৃহ হইতে সাবিত্রী ডাকিল, মেধা উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিজয়া চাপাস্বরে বলিলেন, "দিদি, মেয়ের মনের কথা জানতে আমার বাকি নেই, কিন্তু তাতে আমাদের হাত নেই যে ভাই। যেমন রোখের মুখে মেধা চলে তেমনি স্বরে আমায় বলেছিল—কেন, বিয়ে না করলে বুঝি হয় না, আমি বিয়ে করব না। সেই দিনই ওর মনের গোপন কথা আমার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল দিদি, আর কেউ ওকে না বুঝলেও আমি ওকে বুঝি, আমি ওকে চিনি, কেননা আমি ওর মা। কিন্তু সে কথা তুলে আর কি হবে দিদি, যা কখনও হবার নয়, তা হতেও পারে না তাই ধমক দিয়ে ওকে সোজা পথে এনেছি। ও বুঝতে পারেনি আমি তার মনের কথা জেনেছি, আমিও জানবার সুযোগ দেই নি। দিদি ব্রাহ্মণের মেয়ে তুমি, তোমাদের আমরা দেবীর অংশ বলেই জানি, ভক্তি করি, আশীর্ব্বাদ করো—যেন সকল কথা মেধার মন হতে মুছে যায়, মেধা যেন নতুন জীবন নিয়ে নতুন সংসারে প্রবেশ করতে পারে, স্বামীকে ভালবাসতে পারে, ছেলেবেলাকার কথা ওর মন হতে লুপ্ত হয়ে যাক, মেধা আমার সুখী হোক।"

মুখ ফিরাইয়া বিজয়া চোখ দুইটী অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন।

বিকৃতকণ্ঠে নারায়ণী বলিলেন, "আমিও বুঝেছি বিজয়া, আমার মুখ দিয়ে একটু আভাস বুঝি বেরিয়ে গেছে তাই মেধা অমন করে চলে গেল। আশীর্ব্বাদ করার কথা বলছো, সে কি একবার করে করব বোন, আমি যে নিশিদিন সেই আশীর্ব্বাদই করছি, মেধা যেন সুখী হয়।"

বিজয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "এখন চললুম দিদি, দু দিন আসবার অবকাশ আর পাব না। পার যদি, সন্ধ্যের দিকে শরীরটা যদি একটু ভাল বোধ কর,—বউমাকে নিয়ে একটু আস্তে আস্তে গিয়ে বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করো।"

নারায়ণী বলিলেন, "ভাল থাকলে যাব বই কি বোন।"

বিজয়া বাহির হইলেন।

(১৪)

দিন দিন যতীন যেন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, কয়েকবৎর পূর্ব্বে যে গ্রাম্য বালক যতীনকে দেখিয়াছে সে আজকালকার এই তরুণ যতীনকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে না।

উমাপতিবাবু খুব খুসি হইয়া উঠিয়াছিলেন, একদিন অন্তঃপুরে গৃহিণীকে ডাকিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "জামাই এবার ঠিক কায়দায় এসেছে দেখছো তো?"

গম্ভীরমুখে গৃহিণী বলিলেন, "সুযোগ তো যথেষ্ট দিয়েছ এখন হঠাৎ না ফণা ধরে বসে।"

বিস্মিত হইয়া উমাপতি বাবু বলিলেন, "ফণা ধরা কি?"

শোভনা বলিলেন, "গরীবের ছেলেকে যে রকম ভাবে স্পর্দ্ধা দিচ্ছো তাতে ও মাথায় উঠে না নাচলে বাঁচি।"

উমাপতি বাবু মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তো ঠিক এই রকমই চাই। পুরুষ ছেলে পুরুষের মত হবে, জমিদার হবে সে—এখন হতে চালগুলো তাকে শিখিয়ে রাখা চাই তো। ওই যে সেদিন তুমি বলছিলে যতীন কোন চাকরটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, তুমি জানোনা এ অধিকারটা তাকে আমিই দিয়েছি। তার মনে অহঙ্কার জাগিয়ে তুলতে আমিই প্রাণপণ চেষ্টা করছি যেন সে গরীবের ছেলে বলে সেই ভাবেই না থাকতে চায়। সেটা গেছে ওর অতীত

জীবনের কথা, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে সে জমিদার, সে দরিদ্র ঘরের ছেলে নয়। তুমি কি বলতে চাও, তোমার জামাই অতীতের সেই স্মৃতিটা মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে?"

শোভনা রাগ করিয়া বলিলেন, "আমি কি সেই কথা বলেছি? তোমার জামাই এখন তার মা বউদিকে এনে রাখতে চায়, সে বিষয়ে তোমার মত আছে কি?"

উমাপতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা সে তোমায় বলেছে কি?"

শোভনা বলিলেন, "স্পষ্ট বলতে কাল সাহস পায় নি, তবে একদিন যে এ অনুরোধ করবে তা জানা কথা।"

মাথা নাড়িয়া উমাপতি বাবু বলিলেন, "না, আমি তাঁদের আমার বাড়ীতে এনে রাখতে পারব না। তবে যতীন যদি বলে তবে তাঁদের মাসে কিছু করে সাহায্য করতে পারি।"

শোভনা উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "অন্যায় কথা, তাঁদের সাহায্য করার দরকার কি?"

উমাপতি বাবু শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "গরীব হিসেবেও সাহায্য করা যেতে পারে শোভা, দেশের অনেক অনাথা বিধবাও তো এমনি সাহায্য পায়।"

শোভনা তেমনই সুরে বলিলেন, "কাল তিনি আমায় একখানা পত্র দিয়েছেন—যতীনের সঙ্গে ইলাকে দুদিনের জন্যে যেন ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিনি একবার দেখবেন। তুমি কি বল এদের পাঠানো উচিত?"

উমাপতি বাবু বলিলেন, "সেটা তোমার পরে নির্ভর করছে।"

রাগ করিয়া শোভনা বলিলেন, "তুমি কিছুই জান না, সবই জানি আমি,—না? সাত আট বছর আগে একবার জোর করে ইলাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলে না, বাপুরে, মেয়েটা তার পর একটা বছর জ্বরে ভুগল, আবার আমি সেখানে ওকে পাঠাব? যতীনকেও আমি যেতে দেব না, কেননা সে এখন তাদের ছেলে হ'লেও ইলার স্বামী বলে তার ভাল মন্দের ওপরে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে।"

উমাপতি বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও সেদিনে কার মুখে শুনেছিলুম যতীনের মা বড় অসুখে ভুগছেন, ডাক্তারে নাকি বলেছে, কালাজ্বর হয়েছে, বেশী দিন বাঁচবেন না যদি চিকিৎসা ঠিক মত না হয়। সেখানে চিকিৎসা যে কত হচ্ছে সে জানা কথা। সেই কথা যতীনও শুনেছিল, সেইজন্যেই বোধ হয় সে মাকে এখানে এনে চিকিৎসা করাতে চায়।"

শিহরিয়া উঠিয়া শোভনা বলিলেন, "কালাজ্বর? সর্ব্বনাশ, ও নাকি ভারি ছোঁয়াচে ব্যারাম, আমি কখনো আমার বাড়ীতে ও রোগী আনতে দেবো না।"

উমাপতি বাবু বলিলেন, "যতীন একা যদি দুদিনের জন্যে দেশে যেতে চায়?"

ঝঙ্কার দিয়া শোভনা বলিলেন, "যেতে চাইলেই অমনি যেতে দেওয়া হবে? যে ঘরজামাই তার স্বাধীনতা কতখানি আছে, তা কি সে জানতে পারে না? এখন সে একা নয়, তার 'পরে ইলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জেনে তার বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।"

কথার রেসটা যতীনের কানে কখন কেমন করিয়া যে গিয়া পৌঁছাইল তাহা বলিতে পারি না। এতদিন সে চুপ করিয়া ছিল, বাড়ীর কথা মনে আসিলেও মুখে একটী কথা সে প্রকাশ করে নাই, সম্পূর্ণ ভাবে ইঁহাদের আজ্ঞা পালন করিয়া চলিত।

সময় সময় এ সম্মানের বোঝা বহন করা তাহার বড় অসহ্য মনে হইত। দ্বারবান, দাসী, ভৃত্য অন্য লোকজন সকলে তাহাকে অভিবাদন করিত, তাহার মনে হইত সকলে তাহাকে বিদ্রুপ করিতেছে। কবে সেদিন আসিবে, যেদিন সে সকল বন্ধন কাটিয়া পলাইতে পারিবে।

আজও সে গম্ভীরমুখে খোলা জানালাটীর ধারে একখানা চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিল—কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। হায় রে, কি দিনগুলাই চলিয়া গিয়াছে। পিছনে যাহা সে ফেলিয়া আসিয়াছে ফিরিয়া গিয়া আর কি তাহা পাইতে পারিবে?

সম্মুখে আবার পূজার বন্ধ আসিতেছে, আবার ছুটি হইবে, প্রবাসী আবার ঘর মুখো ছুটিবে। সে যে পূজার ছুটির আশা মনে করিয়া আসিয়াছিল তাহার পর চার পাঁচটা পূজার ছুটি চলিয়া গেছে; সে পূজার বন্ধে দার্জ্জিলিং গিয়াছে, সিমলা গিয়াছে, ডেরাডুন, মাদ্রাজ বেড়াইতে গিয়াছে, এখান হইতে একবেলার পথ নিজের গ্রামে যাইবার অধিকারটুকু পায় নাই।

যখন সে ম্যাট্রিক পাশ করিল, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া শোভনাকে বলিয়াছিল, আমি দেশে যাব, মাকে এ খবর দিয়েই চলে আসব।”

মুখখানা অন্ধকার করিয়া শোভনা বলিয়াছিলেন, "কেন, তোমার মা কি এ খবর পাবেন না? ম্যানেজারবাবু চিঠি লিখে জানাবেন, তোমার এখন পড়া কামাই করে সেই পাড়াগাঁয়ে যেতে হবে না। সেখানে গিয়ে তো আবার জ্বর আর পেট জোড়া পিলে নিয়ে আসবে, সেবা করতে তখন আমাদেরই প্রাণান্ত হবে।"

আনন্দের যে ঢেউ বহিয়া চলিয়াছিল হঠাৎ তাহার মুখে কে বাঁধ দিয়া দিল। জল ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া ফিরিতে লাগিল, বাঁধ ভাঙ্গিবার ক্ষমতা আর তাহার হইল না।

বড় আঘাত পাইয়াই যতীন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর এই চার বৎসরের মধ্যে সে একটী দিন একবারের জন্যও দেশের নাম বা মায়ের নাম করে নাই। তরুণ হৃদয় তাহার যখন অসহ্য বেদনায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিত সে তখন মণীন্দ্র বাবুর নিকট ছুটিত।

মণীন্দ্র বাবু এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যতীনকে রীতিমত ভাবে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না বলিয়া উমাপতি বাবু তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন, মণিন্দ্র বাবুর আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি তখনই কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

মণিন্দ্র বাবুর কাছ ছাড়া হইয়া যতীন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে যেন ইঁহাদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে যে দিকে ফিরানো হইত সেই দিকেই সে ফিরিত, আত্মবোধ শক্তি যেটুকু তাহার মধ্যে ছিল মণীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

আর দুই দিন বাদেই কলেজ স্কুল সব বন্ধ হইয়া যাইবে, ইলাও দার্জ্জিলিং মাসীমার বাড়ী হইতে বাড়ী আসিবে। এখানে বোর্ডিংয়ে

তাহাকে রাখিয়াও শোভনার মনে শান্তি ছিল না, তিনি তাহাকে নিজের ভগিনীর কাছে পাঠাইয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইলা এবার ম্যাট্রিক একজামিন দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, পূজার বন্ধে সে দুচার দিন থাকিয়াই ফিরিয়া যাইবে।

স্ত্রীর কথা ইচ্ছা করিয়াই যতীন ভুলিয়া গিয়াছিল। সেবার দার্জ্জিলিংয়ে ইলার সহিত তাহার আধ ঘণ্টার জন্য মাত্র দেখা হইয়াছিল, স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রথমটায় তাহার হৃদয় কেমন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পরমুহূর্ত্তে তাহার গর্ব্বপূর্ণ অন্তরের পরিচয় পাইয়া যতীনের মনটা নিমেষে তাহার নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে সে যে ক্ষুদ্র ইলাকে স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় আপনার পাশে মুহূর্ত্তের জন্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল, সে ইলার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মানুষ বড় হইলে কেমন করিয়া বদলাইয়া যায় তাহা যতীন আজও বুঝিতে পারে না।

সে তো বড় হইয়াছে, শিক্ষিত হইয়াছে, ধনবানের আদরের জামাতা সে, তবু তো এ অবস্থা তাহার প্রার্থনীয় নহে; সে ভাবিতেছে সে যদি তাহার সেই খড়ের ঘরে ঘুরিয়া যাইতে পায়, মায়ের কোলে মাথা রাখিতে পায়, পূর্ব্বের বন্ধুদের কাছে পায়—সেই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করা হইবে।

মায়ের অসুখের কথা সে পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়া আসিতেছে, সে অসুখ যে কালাজ্বরে পরিণত হইয়াছে এবং ডাক্তারেরা যে উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের কথা বলিয়াছেন তাহা সে শুনিতে পায় নাই। আজ শোভনা ও

উমাপতি বাবু যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন দূর হইতে তাহারই দুই একটা শব্দ মাত্র তাহার কানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল।

মায়ের পত্র অনেককাল সে পায় নাই। মায়ের উপর রাগ করিয়াই সে মাকে পত্র দিত না, মা কি ইহা বুঝিতে পারেন নাই? সে যে জীবনের পাথেয় লেখাপড়াটা কোন রকমে শিখিয়া লইয়া এখানকার বাঁধন কাটিয়া পলাইবে তাহা তো কেহ জানে না।

যদি সে মানুষ হইয়া ফিরিয়া গিয়া মাকে আর না দেখিতে পায়—

অতর্কিতে যতীনের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তাই কি হইতে পারে? আর কয়েক মাস পরেই তাহার একজামিন হইবে, তাহার পর আর তাহাকে পায় কে?

গৃহের পাশ দিয়া যাইতে উমাপতি বাবুর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আত্মবিস্মৃত যতীন জানিতে পারিল না।

ছেলেটীকে উমাপতি বাবু যথার্থই একটু বেশী রকম স্নেহ করিতেন। যাহাতে তাহাকে আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারেন সেই দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। শোভনা যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

"যতীন—"

হঠাৎ পিছনে তাঁহার আহ্বান শুনিয়া যতীন চমকাইয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ গৃহে উমাপতি বাবুর প্রবেশ একেবারে অপ্রত্যাশিত।

যতীনের মুখ দেখিয়াই উমাপতি বাবু বুঝিলেন গৃহিনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আঘাত পাইয়া তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

জামাতার স্কন্ধের উপর হাতখানা রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমার মায়ের সম্বন্ধে যা কথা হচ্ছিল তা তোমার কানে এসেছে বুঝতে পারছি। তোমার মায়ের যে অসুখ হয়েছে তা বোধ হয় শুনেছ।"

যতীন মুখ নিচু করিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

উমাপতি বাবু বলিলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা তাঁকে এখানে এনে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাই। ওখানে ম্যালেরিয়াতে বেশী ভুগে —অত্যাচার করে শেষটায় জ্বরটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে এসে যদি একটা মাসও চেপে থাকেন—"

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া যতীন বলিল, "না, মা এখানে আসবেন না।"

উমাপতি বাবু তাহার কণ্ঠস্বরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, শুনলুম তুমিও নাকি বলছিলে তাঁকে আনার কথা ?"

বিবক্তিটা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া যতীন বলিল, "না, আমি তাঁকে আনবার কথা বলিনি।"

এবার উমাপতি বাবু চোখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "বলনি! তবে যে তোমার শাশুড়ী বলছিলেন—,"

যতীন দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না, আমি মাকে আনবার কথা বলিনি। আমি কি জানিনে—এখানে আসার চেয়ে মার মরাও ভাল ? স্বাধীন জীবনে ভিক্ষা করে খাওয়া ভাল, গাছতলায় পড়ে থাকাও ভাল, তবু আমার মত হেয় ঘৃণ্য পরাধীন জীবন যেন কেউ প্রার্থনা না করে।"

বড় আঘাত পাওয়ার ফলেই আজ তাহার গোপন কথাটা উমাপতি বাবুর সামনে বাহির হইয়া পড়িল। কথা কয়টা বলিয়াই সে দ্রুতপদে

সরিয়া গিয়াছিল, স্তম্ভিত উমাপতি বাবু নির্ব্বাকে শুধু তাকাইয়া ছিলেন।

শোভনার কথাই সত্য,—অতিরিক্ত আদর পাইয়া—ধরিতে গেলে, পরান্নে প্রতিপালিত—কুটীরবাসী যতীনও বদলাইয়া গিয়াছে, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উমাপতি বাবুর সম্মুখেই যা-তা বলিয়া গেল।
স্ফীতবক্ষে উমাপতি বাবু বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। উত্তরটা দেওয়া হয় নাই, এখনই দেওয়া চাই, তাই ভৃত্যকে আদেশ করিলেন—"জামাই বাবুকে ডাঁক।"

খানিকপরে সে আসিয়া জানাইল, "জামাই বাবু বাড়ী নেই।"

উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া উমাপতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেছে?"

সভয়ে সে উত্তর দিল, "তা কিছু বলে যাননি। জব্বু মিয়া গাড়ীর কথা বললে, তিনি তার কথার উত্তর না দিয়ে পায়ে হেঁটে এই দিককার পথ দিয়ে চলে গেলেন।"

গৌরীবাবু অদূরে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন, কর্ত্তাবাবুর ভাব দেখিয়া সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারেন নাই, এখন আস্তে আস্তে বলিলেন, "বোধ হয় মণিবাবুর বাসায় গেছেন, তাঁর বাসা খুবই কাছে, এই মোড়টা ঘুরতেই—"

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া উমাপতি বাবু বলিলেন, "ওই মাষ্টারটাই যত নষ্টের মূল। এ ছেলেটা ছিল ভাল, হতোও ভাল, ওই যে সব লম্বা চওড়া কথা—আত্মসম্মান, আত্মজ্ঞান, এই সব উপদেশ দিয়েই মাটী করলে। ভাল, দেখা যাবে, একটা মাষ্টারকে জব্দ করতে আমার কয় দিন লাগে।

এই বুনো ওলকেও যদি বস না করতে পারি, তবে আমার নাম উমাপতিই নয়। এই আত্মসম্মান, আত্মবোধ জ্ঞান বন্ধ হয়ে যাবে সেই দিন—যে দিন যেমন বেশে এসেছিল তেমনি বেশে দূর করে দেব। আগে পাড়াগাঁয়ে থাকতে পেরেছিল কারণ সহর কি তা জানত না, এখন পাড়াগাঁয় দুদিনও থাকতে হবে না, পায় ধরে যখন আসতে চাইবে তখন আবার ঢুকতে দেব।"

রাগে তিনি ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

---

(১৮)

পূজার ছুটিতে ইলা আসিয়া পৌছাইল। সে শুধু একা আসে নাই, সঙ্গে তাহার মাসীমার মেয়ে কল্যাণী আর একটী ক্লাস ফ্রেণ্ড বীণা।

কল্যাণী মেয়েটী বড় শান্ত নম্র প্রকৃতির। গাত্রবর্ণ তাহার ইলার মত শুভ্রোজ্জ্বল নহে, বাঙ্গালীর ঘরে যে শ্যামবর্ণের আধিক্য দেখা যায়, তাহার বর্ণ তাহাই। বড় বড় চোখ দুইটীর দৃষ্টি প্রখর নয়, বড় শান্ত। ইলার ও তাহার বন্ধু বীণার মধ্যে যে দাম্ভিকতা ফুটিয়া উঠিতেছিল, এ মেয়েটীর মধ্যে তাহার কিছু ছিল না। বয়সে সে ইলার সমান হইলেও গত বৎসর ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ লাভ করিয়া সে এবার আই, এ, পড়িতেছে।

মোটরখানা যখন এই তিনটী মেয়েকে বহন করিয়া গেটে আসিয়া দাঁড়াইল তখন শোভনা, উমাপতি বাবু সকলেই সেখানে ছিলেন। মণীন্দ্র বাবু ও যতীন রিডিং রুমের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। যতীনকে ষ্টেশনে যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, মুখখানা লজ্জায় তখন তাহার যে রকম লাল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়া উমাপতি বাবু দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে মুক্তিদান করেন।

অন্যবার ইলা আসিবার আগেই যতীন কলিকাতার বাহিরে উমাপতি বাবুর সহিত চলিয়া যাইত, এবার তাঁহার শরীর খারাপ হওয়ায় পূজার সময় কোথাও যাওয়া হয় নাই, বাধ্য হইয়া যতীনকে এবার এখানে থাকিতে হইয়াছে।

মোটর হইতে নামিবার সময়ে বীণার চোখ যতীনের উপর পড়িল, সকৌতুকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওই নাকি ইলার বর? বাঃ—সুন্দর—,

কথাটা যতীনের কানে গিয়া পৌছাইতেই তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে মণীন্দ্র বাবুর হাত ধরিয়া টানিল, "ঘরে আসুন মাষ্টার মশাই, এখানে দাঁড়াবেন না।"

একটু হাসিয়া মণীন্দ্র বাবু বলিলেন, "তুমি ঘরে যাও যতীন, আমি যাচ্ছি।"

যতীন তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

বীণা ইলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে বলিল, "বাহবা রে, তোর চেয়ে বছর দুইয়ের বড় হবে নাকি রে, বিদ্যে কতদূর?"

ইলা হাসিয়া বলিল, "আমি অত খোঁজ নেই নি।"

বীণা বলিল, "যাই বলিস ইলা, অত তাড়াতাড়ি কেন তোর বিয়ে দেওয়া হল ওর সঙ্গে? যে যাই বলুক, আমি কখনই স্বীকার করব না ও তোর উপযুক্ত হয়েছে। তোর বাপ মায়ের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।"

কল্যাণী পাশে চলিতেছিল চুপচাপ, সে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে-ছিল, ধীরকণ্ঠে বলিল, "উপযুক্ত নয়ই বা কিসে? সুন্দর চেহারা, শুনেছি এম, এ, পড়ছেন—,"

ইলা মুখ ভার করিয়া বলিল, "তা হলেই খুব ভাল ছেলে হয়ে গেল—না কল্যাণী? ঘরজামাই যে, তার আবার ভাল; নিজের মর্য্যাদা যে এমন করে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তার পরে এতটুকুও শ্রদ্ধা আসতে পারে না, তা বোধ হয় জানো?"

ব্যথিতকণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "তোর না আসতে পারে ইলা, আমার আসে, কেননা এ স্বেচ্ছায় বড় হতে আসেনি, একে এর মা জোর করে দিয়েছে। কেন শ্রদ্ধা আসে, তার উত্তর, এর মায়ের অপূর্ব্ব ত্যাগ। এর তখন ভালমন্দ জ্ঞান ছিল না, শুনেছি কিছুতেই আসতে চায় নি, মায়ের চোখের জল একে তোদের ঘরে এনে দিয়েছে।"

ইলা আড়চোখে যতীনের ঘরের পানে তাকাইয়া বলিল, "তোর শ্রদ্ধা আসতে পারে, কেননা মনটা তোর ভারি উদার, জগতের মধ্যে অতি ক্ষুদ্রকেও তুই ভক্তি করিস, ভালবাসিস, এ তো একটা মানুষ। আমি কিন্তু জীবনে কক্ষণো ঘরজামাইকে শ্রদ্ধা করতে পারব না, ভাল বাসতেও পারব না। গরীব হলেও যদি তার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকে, তাকে মানুষ বলতে পারা যায়, একি মানুষ নামে গণ্য হতে পারবে কোন দিন, তাই ভাবছিস কল্যাণী? লোকে কথাতেই কত কথা বলে—আমি—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ পার্শ্বে দণ্ডায়মান মণীন্দ্র বাবুর পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে থামিয়া গেল।

হাসিমুখে মণীন্দ্র বাবু তরুণীদের পানে তাকাইয়া ছিলেন, তিনজনেই থামিয়া গেল দেখিয়া তিনিই অগ্রসর হইয়া আসিলেন, একটা ক্ষুদ্র অভিবাদন করিয়া হাসিমুখেই তিনি বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছেন ইলা দেবী, আপনার মনের উদ্দেশ্য মহৎ, তা স্বীকার করছি।"

ইলা অকারণ লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "কই—কি বলেছি আমি?"

মণীন্দ্র বাবু বলিলেন, "আত্মমর্য্যাদার কথা। এখন আপনারা শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, বিশ্রাম করুন গিয়ে, সন্ধ্যের দিকে যদি আসি এ বিষয় নিয়ে

কথাবার্ত্তা হবে এখন। আপনাকে আমার পৃষ্ঠপোষিকা পেলে বাস্তবিকই আমি ভারি খুসি হব।"

ইলা বলিল, "যদি আসেন, এ কথার মানে? আপনি কি এখানে থাকেন না মণিবাবু?"

মৃদু হাসিয়া মণীন্দ্র বাবু বলিলেন, "না, এই আত্মজ্ঞান, আত্মমর্য্যাদা ব্যাপারটা নিয়েই গোল বেধেছিল, তারই জন্যে আমায় বাধ্য হয়ে বেরুতে হয়েছে। তবে একেবারে যে আসিনে তা নয়, দিনে দুবার তিনবার আসি, কারণ যতীনকে আমি নিজের ভাইয়ের মতই ভালবেসেছি, তাকে একটা দিন না দেখলে থাকতে পারিনে। আচ্ছা, আসি এখন নমস্কার।"

একটা নমস্কার করিয়া তিনি সোজা রাস্তা ধরিলেন।

সে দিনটা ভারি গোলমালেই কাটিয়া গেল; তিনটী মেয়েতে বাড়ী খানা মুখর করিয়া তুলিল। ইহার মধ্যে কোথায় যতীন, কে তার খোঁজ রাখে। সে বেচারাও আজ নিজের গৃহ হইতে বাহির হয় নাই, পাঠ্য পুস্তকে হঠাৎ তাহার মন নিবিড়ভাবে বসিয়া গিয়াছে, এতটুকু হাঁফ ছাড়ার অবকাশ যেন তাহার নাই।

ইলার মুখে সে যে ঘৃণা জাগিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে চিরতরে আঁকিয়া গিয়াছিল। এই স্ত্রী লইয়া সে সুখী হইবে—কখনই না। স্ত্রী স্বামীর সমসুখদুঃখভাগিনী হয়, তাহার ইলাকে স্ত্রী বলা সাজে না। ইলা জমিদারের আদরিনী কন্যা—আর—আর সে জমিদারের ঘরজামাই।

কিছুদিন হইল হঠাৎ কেমন করিয়া যে দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক নাটকখানি তাহার পড়ার টেবলের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহাই

আশ্চর্য্যের কথা। অবশ্য ইহাতে হাত ছিল ম্যানেজার বাবুর ছেলে ভূপেশের। সে যতীনের সমবয়স্ক ছিল, যতীনকে দেখিতে পারিত না। যতীনের গ্রামের নরেন তাহার বন্ধু ছিল, ইহারই কাছে সে যতীনের আদ্যোপান্ত পরিচয় পাইয়াছিল। একবার নরেনের আহ্বানে সে তাহাদের গ্রামে গিয়া স্বচক্ষে যতীনের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছিল। প্রকাশ্যে সে কিছু বলিতে পারিত না, লুকাইয়া চুরাইয়া যেটুকু কাজ করা যায় করিত।

জামাই বারিকখানা যতীন খানিকদূর পড়িয়া আর পড়িতে পারে নাই, ধিক্কারে তাহার সারাহৃদয়টা ভরিয়া গিয়াছিল, বইখানা দূর করিয়া সে ফেলিয়া দিয়াছিল।

ঘরজামাই যে কি ঘৃণ্য জীব তাহা সে সেই দিন যথার্থ ধারণা করিতে পারিল। সেদিন হইতে সে আর মন খুলিয়া হাসিতে পারে নাই, এই সংসার হইতে যতদূর সম্ভব দূরে রহিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে সকলের অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, গঙ্গার ধারে পথে পথে ঘণ্টাখানেক পদব্রজে বেড়াইয়া সে যখন বাড়ী ফিরিতেছিল তখন পথে নরেন ও ভূপেশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। নরেন বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল, "একি, তুমি যে আজ হেঁটে বেড়াতে এসেছ যতীন? হাঁটতে পারছ না, একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেব কি?"

কথাটার মধ্যে যে কতটা তীব্র উপহাস ছিল, তাহা যতীনই বুঝিল, সে শুষ্ক হাসিয়া একটা ধন্যবাদ জানাইয়া দ্রুত চলিল।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল, গেট দিয়া প্রবেশ করিতে দুই দিকে ফুলবাগান ছিল, পথের বাম দিককার বেঞ্চে বসিয়া ইলা ও বীণা; দক্ষিণ দিকে বসিয়া কল্যাণী। প্রবেশ করিতে গেলে

ইহাদের মাঝখান দিয়া যাইতে হয়, যতীন তাই থমকিয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া গেল।

নিকটেই যে শোভনা বেড়াইতেছিলেন সে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। তিনি পূর্ব্বে কি বলিতেছিলেন, শেষের দিককার কথাগুলি যতীনের কানে আসিল, "বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া যাকে বলে তাই। আগে যদি জানতুম এমন ধারা হবে তা হলে কি বিয়ে দিতে দিতুম? ছিঃ ছিঃ, হাড় যেন ভাজা ভাজা হয়ে গেল।"

কল্যাণী তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর যখন হাত নেই মাসীমা, তখন সে কথা না তোলাই ভাল, তার এখনকার উপযুক্ত কাজ করাই যুক্তিসঙ্গত।"

তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রুক্ষকণ্ঠে শোভনা বলিলেন, "এখনকার উপযুক্ত কাজ ইলাকে যতীনের সঙ্গে সেই পাড়াগাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া, তুই কি তাই বলতে চাস্ কল্যাণী?"

কল্যাণী শান্তভাবে বলিল, "নিশ্চয়ই তাই বলি মাসীমা। মনে করে দেখ দেখি মায়ের বুকের ব্যথা, ছেলেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার ক্ষমতা অনাথা বিধবার নেই বলেই তোমাদের দিয়েছেন, ছেলের পানে চেয়ে ছেলেকে ত্যাগ করেছেন। তোমাদের এটুকু কি বোঝা উচিত নয় মাসীমা—ছেলেকে ত্যাগ করলেও দেখবার আশা ত্যাগ করতে পারেন নি? তোমাদের মেয়ে জামাই তোমাদেরই থাকবে, তিনি একবার শুধু দেখে যেতে চান—এই তাঁর মৃত্যুশয্যার অনুরোধ। জানিনে তোমরা কি রকম হৃদয়হীন মাসীমা, মানুষের এমন কাতর অনুরোধকেও এমন করে ঠেকাতে পার?"

আরক্তমুখে ইলা বলিল, "অনেকগুলো কথা এ পর্য্যন্ত বলেছিস কল্যাণী, তার উত্তর গোটাকত আমার কাছ হতেই শোন। মানুষের কথা বলছিল—মানুষ কে আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি। যাঁর কথা বলছিস তিনি যদি মানুষ হতেন ছেলের উন্নতির পানে চেয়ে ছেলের স্বাধীনতা বিক্রি করতে পারতেন না। অর্থ আর স্বাধীনতা এই ছুটো জিনিস যদি নিক্তিতে ওজন করে দেখা যায় তা হলে স্বাধীনতার দিকই বেশী ভারি হবে। স্বাধীনভাবে থেকে যে ভিক্ষা করেও জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি, তাকে আমি মানুষ বলতে পারি কারণ যথার্থ মনুষ্যত্ব তারই মধ্যে আছে। যারা অর্থের বিনিময়ে, প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে স্বাধীনতা বিক্রি করে, তারা মানুষ নয়, তারা পশু, আমি তাদের ঘৃণা করি।"

কল্যাণী বলিল, "চুপ কর ইলা, মা হোসনি তাই জানতে পারিস নি মা কি জিনিস, সন্তানের ইষ্টের জন্যে মা না করতে পারে এমন কাজই নেই। যে মা—সন্তানকে ধনপতি জমিদারের ঘরজামাই হতে দিয়েছেন, তিনি বোধ হয় দেওয়ার সময় মনেও ভাবেন নি তাঁর ছেলের স্বাধীনতা এমন ভাবেই লুপ্ত হয়ে যাবে। ঘরজামাই অনেকেই হয়ে থাকে কিন্তু তোরা যেমন ছেলেটীকে ছোট পেয়ে তার সকল স্বাধীনতা নিয়েছিস, সে রকমভাবে কেউ নিতে পারে নি।"

ইলা রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "এ তোমার ভুল ধারণা কল্যাণী, যদি যথার্থরূপে বুঝতে তা হলে জানতে আমার মা বাপ ওর স্বাধীনতা কাড়েন নি। গরীবের ছেলে—যে পরনে একখানা কাপড় পেত না, পেট ভরে ছুবেলা খেতে পেত না, সে এখানে বড়লোকের বাড়ীর জামাই হয়ে নিজেই

জড়িয়ে পড়েছে, তার স্বাধীনতা নিজেই সে বিক্রি করে বসেছে। আমরা যদি তাকে মুক্তি দিতেও চাই, সে মুক্তি পেতে চাইবে না। এইখানে সকলের ঘৃণা কুড়িয়েও তাকে পড়ে থাকতে হবে।"

বীণা তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "যাক, আর ঝগড়া বিবাদে কাজ নেই। রাত হয়ে গেছে, সন্ধ্যেবেলা ইলার গান শোনানোর কথা ছিল, চল গান শুনাবে। অনর্থক আজকের এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা মাটি করে দিলে। চলুন মা, ইলা কত নতুন গান শিখে এসেছে শুনবেন।"

স্থানটা অনতিবিলম্বে শূন্য হইয়া গেল।

আড়ষ্ট যতীন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া, ভিতরে সে কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। তাহার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিতেছিল, বুকটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

"জামাই বাবু এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে যান।"

বিহ্বলনেত্রে যতীন তাকাইয়া দেখিল রাখাল। সে একটাও কথা বলিল না, একরকম প্রায় টলিতে টলিতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

রাত্র দশটার সময় আহারের জন্য ভৃত্য আসিয়া রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিতে লাগিল, যতীন সাড়া দিল না, ভৃত্য ফিরিয়া গেল।

দুষ্ট রাখাল রটাইয়া দিল—জামাই বাবু আজ মদ কি ভাং খাইয়া আসিয়াছেন। তিনি যে চলিতে পারিতেছিলেন না, শেষটায় রাখালের স্কন্ধে ভর দিয়া টলিতে টলিতে নিজের গৃহে আসিয়াছেন, তাহাও সে জানাইয়া দিল। গৃহিণী অন্ধকার মুখে ভারি গলায় শুধু বলিলেন, "আচ্ছা—।"

ইলা রুক্ষকণ্ঠে আদেশ দিল—"আভি উনকো ঘরসে নিকাল দেও।"

চাকরেরা এ আদেশ পালন করিতে পারিল না, কারণ ইলার এমন অনেক অন্যায় আদেশ তাহাদের কানে আসিত যাহা পালন করা দুঃসাধ্য।

বীণা চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, ঘরজামাইয়ের গুণ জামাইবারিকে দীনবন্ধু বাবু বেশ বর্ণনা করে গেছেন, পড়লে লোকের জ্ঞান হয়।"

কল্যাণী শুধু একটা কথাও বলিল না, গম্ভীরমুখে গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

---

(১৬)

তিন চার দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, যতীন এ দিকে ঘেঁসিল না, কেহ তাহাকে ডাকিলও না। কর্ত্তাবাবু জামাতার উপরে ভীষণ রকম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং জামাতার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

চলিয়া যাইবার জন্য যতীন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, সাহস করিয়া কথাটা কিছুতেই মুখে আনিতে পারিতেছিল না। সতত্ই মনটা নিরন্তর আঘাত পাইয়া জড় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ছোট বেলার সে তেজ দর্প তাহার মধ্যে ছিল না।

মণীন্দ্র বাবু পূজার বন্ধে দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, যতীন আরও জড় হইয়া পড়িয়াছিল।

সপ্তমী পূজা আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যাবেলায় রায় যদুনাথ সেন বাহাদুরের বাড়ীতে পূজার নিমন্ত্রণ। মেয়েদেরই সাজিবার ঝোঁকটা বেশী, ইলা দুপুর হইতে বীণাকে পাইয়া বসিয়াছে। কল্যাণী নিতান্ত সাধাসিধা প্রকৃতির, বিলাসিতার পক্ষপাতিনী সে মোটেই ছিল না, সেই জন্য সাজ পোষাকের দিকে তাহার লক্ষ্যও ছিল না, সে ততক্ষণ বাড়ীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। শোভনা তাহাকে অনেক ধমক দিয়াও ঠিক পথে আনিতে পারেন নাই, অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বীণা বলিতেছিল—সত্যি ভাই, পূজো কিম্বা আরতি দেখতে যেতে আমার ইচ্ছে নেই, তোদের এ দেশে মেয়েরা কি রকম ভাবে চলাফেরা করে, শুধু সেইটে দেখবার জন্যেই আমি যেতে চাই। বাংলা হতে চিরকাল দূরেই আছি, বরাবর পাহাড়ে বাস করছি, বইতে যা বাংলার পূজার কথা পড়ে জেনেছি, চাক্ষুস কখনও দেখিনি।

ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতিমা কখনও দেখিস নি?"

বীণা একটু হাসিয়া বলিল, "বাবা, আমি যা দেখেছি সে কথা মনে করলে হাসি পায়। সত্যি কি অদ্ভুত যায়গায় বাস করিস তোরা ইলা, ঠাকুর দেবতা গুলোও তেমনি অদ্ভুত। চার হাত বার করে, এতখানি জিভ বার করে, স্বামীর বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন, লজ্জায় সে দিকে তাকানো যায় না। এই যে দুর্গামূর্ত্তি পূজো হয়, বাপরে দশটা হাত তিনটে চোখ—যা বাস্তবিকই ধারণার বাইরে। অনেকে মনে ভাবে ভগবানকে ভয় করে মেনে চলতে হয়, তাই তারা তেমনি এক একটা বিকট মূর্ত্তি কল্পনায় এঁকে তুলেছে। ও সব মূর্ত্তি দেখলে ভক্তি ভালবাসা আসা দূরে যায়, ভয়ই আসে, আমি এ রকম ভয়ে ভালবাসা মোটে পছন্দ করিনে। ভগবান রূপ ধরেছেন শুনলে হাসি পায়, মনে হয় আমাদের সে কালের মুণি ঋষিরা গাঁজায় দম দিয়ে অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত করে গেছেন, এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় জেনে শুনেও সে সব মেনে চলেন কি করে?"

কল্যাণী পিছনে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা বীণা জানিতে পারে নাই। বীণার কথা শেষ হইলে কল্যাণী সম্মুখে আসিয়া একটু হাসিয়া বলিল, খাঁটি সত্যি কথা বলেছিস বীণা, কিন্তু ইলার কাছে এ

প্রশ্নের উত্তর পাবিনে ভাই, উত্তর পাবি আমার কাছে। ইলাটা কোন কাজের নয়, এ সব বিষয় নিয়ে, এক দিনও মাথা ঘামাতে দেখিনি, দেখেছি শুধু ঘরজামাই বেচারাকে কথায় কথায় বাণবিদ্ধ করে তাড়াবার চেষ্টা করতে, হ্যাঁ, কথা যদি বলতে চাস বীণা, তবে আমার সঙ্গেই বল।”

অনেক সময় সে চুপচাপ থাকিলেও তর্কের সময় এক কথায় পরাজিত হইত না, প্রতিপক্ষ সময় সময় ক্রোধে জ্ঞান হারাইত, এ মেয়েটী শান্ত ভাবেই তর্ক করিত, কোন দিন কেহ ইহাকে উষ্ণ হইতে দেখে নাই। বীণা কল্যাণীকে চিনিত, তাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সে বলিল, “না ভাই কল্যাণী দি, আমি তর্ক করছিনে, দেবতাগুলোর আকার কি রকম তাই বলছি।”

কল্যাণী হাসি মুখেই বলিল, “গোড়াতেই পরাজয় মানছিস বীণা, এতটা দুর্ব্বলতা শিক্ষিতা মেয়ের কিছুতেই শোভা পায় না। তুই তর্ক কর, আমি তাতে রাজি আছি।”

বীণা হাত জোড় করিয়া বলিল, “মাপ করো কল্যাণী দি, তর্ক করবার সময় আমার মোটেই নেই, এখনি পূজো দেখতে যেতে হবে। আগে ফিরে আসি তার পর বেশ নির্জ্জনে ছাদে বসে তোমায় আমায় সারারাত ধরে তর্ক করব। তুমি কাপড় জামা পরে নাও কল্যাণী দি, আমাদের তো হয়ে এলো।”

কল্যাণী একবার উভয়ের উপরে দৃষ্টি বুলাইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, “ইলাকে কিন্তু এ কাপড় খানায় ভাল মানায় নি বীণা, গায়ের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে কাপড় দেওয়া চাই। আমার মতে ওই গ্রীণ রংয়ের

কাপড়খানা পরলে ইলাকে সুন্দর দেখাবে। তোর চোখ নেই বীণা,—সুন্দর মানুষ লাল বা গোলাপী রংয়ের পোষাকে মোটেই ভাল দেখায় না, এ বুঝি বলে দিতে হয় ?

বীণা দোষ স্বীকার করিয়া লইল, ইলাকে কল্যাণীর পছন্দমত শাড়ী পরাইয়া অঞ্চলে ব্রোচটা আটকাইয়া দিতে দিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তোমার জন্যে এই কাপড়খানা পছন্দ করেছি কল্যাণী দি, তোমায় বেশ মানাবে, না ইলা ?"

ইলা জাফ্রান রংয়ের শাড়ীটি হাতে লইয়া অনুনয়ের সুরে বলিল, "সত্যি কল্যাণী, নে ভাই চট করে—"

কল্যাণী দুই পা পিছাইয়া গিয়া তেমনিই শান্তসুরে বলিল, "ক্ষেপেছিস ইলা, আমার কালো রঙ্গে সাদা ভিন্ন আর কিছুই মানায় না তা জেনে শুনেও কেন ও কাপড় ব্লাউস আমায় না জানিয়ে কিনে ফেলেছিস বল দেখি ? বিকেলে বুঝি এই করতেই আমায় না নিয়ে দুজনে চুপি চুপি মার্কেটে গিয়েছিলি ?"

ইলা বলিল, "তোকে তখন খুঁজেই পেলুম না, শুনলুম বাবার কাছে বসে তাঁর কি সব হিসেব মিলাচ্ছিস, তুই এলে বাবার ভারি সুবিধে হয় কিন্তু, তোকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেন। তুই যেমন বোকা কল্যাণী, তাই তোকে সকলেই সব কাজের ভার দেয়, কই, আমায় কেউ দিতে পারে না ?"

কল্যাণী হাসিয়া বলিল, "ওইটুকুই মানুষের বড় অন্যায় ইলা, জীবনের অর্দ্ধেক সময়টা তারা মিথ্যে আমোদে কাটিয়ে দেয় অথচ সেই সময়টা তারা সার্থকতায় ভরে তুলতে পারত। অবশ্য নিজের ক্ষতি

করে কাউকে পরের উপকার করতে বলিনে, নিজের কাজ বাঁচিয়েও তো পরের কাজ হয়ে যায়। তুমি সেটা পাঁচ মিনিটে করে দিতে পার, যার কাজ তার কাছে তা অমূল্য—অথচ তোমার কাছে কিছুই নয়। বড় দুঃখের কথা—সংসারের মানুষ শুধু নিতে জানে, পরে তার কাজ করবে তাই সে চায় কিন্তু পরের জন্যে একটা আঙ্গুলও তুলতে চায় না।”

ধীরভাবে কথা কয়টী বলিয়া ধীরপদে সে বাহির হইয়া গেল। ইলার হাতের কাপড়খানা হাতেই রহিয়া গেল, সেখানা নামাইয়া রাখার কথাও সে যেন ভুলিয়া গিয়াছিল।

বীণা তাহার হাত হইতে কাপড়খানা টানিয়া লইয়া একটু রাগত সুরেই বলিল, “কল্যাণীদির নাগাল পাওয়া ভার, অন্ততঃ পক্ষে আমাদের মত লোক যেন নাগাল পেতে পারে না। এতকাল ধরিতে গেলে প্রায় একসঙ্গেই আছি, তবু ওকে চিনতে পারলুম না। অন্য সময়—মানুষটা যে আছে তার খোঁজ পাওয়া যায় না, হঠাৎ কোন সময় সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন ঠিক এমনি যুদ্ধোদ্যত মূর্ত্তি। তুই পছন্দ করতে পারিস ইলা, আমি এ রকম চরিত্রের কাউকে পছন্দ করতে পারি নে।

ইলা গুম হইয়া রহিল, ভাল মন্দ একটা কথাও বলিল না। তাহার মনে ঠিক কোনখানে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বলা ভার, সে নিজেও তাহা ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না।

শোভনা বাহির হইতে ডাকিলেন, “তোমাদের হয়েছে ইলা? আর দেরী কোরো না, যাওয়ার যদি ইচ্ছে থাকে তা হলে এসো, মোটর দাঁড়িয়ে আছে।”

বীণা ইলার হাত ধরিয়া টানিল, "চল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কল্যাণীদি, নিজের পছন্দমত কিছু পরেছে নিশ্চয়ই, এ কাপড় ব্লাউস পরলে না বলে তোর অতটা মন খারাপ করবার দরকার নেই।"

শোভনা গেটের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন, কল্যাণী সেখানে ছিল না। ইলা একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কল্যাণী কই মা?"

দীপ্তকণ্ঠে শোভনা বলিলেন, "সে যাবে না।"

"যাবে না?"

ইলার সকল উৎসাহ যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার সাজ পোষাক যেন গায়ের উপর অসহ্য বোঝারূপে চাপিয়া বসিল, মনে হইতেছিল—না গেলেই ভাল ছিল। হয়তো সেও বাঁকিয়া বসিত, কেবল বীণার জন্যই পারিল না। বীণা এই কলিকাতায় আসিয়াছে, দুর্গাপূজার ব্যাপারখানা সে স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে চায়।

ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "সে এল না কেন মা?"

মোটরে উঠিতে উঠিতে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে শোভনা বলিলে,ন "ওর কথা আর বলিস নে বাপু, আমার চেয়ে তোরাই বোধ হয় বেশী চিনিস ওকে, তবু যে জিজ্ঞাসা করছিস এই আশ্চর্য্য। দিদি যখন লিখিত কল্যাণী এ দিকে লেখাপড়ায় ভাল হলেও কি রকম আশ্চর্য্য স্বভাবের, তখন চিঠি পড়ে হাসতুম, এখন দেখছি সত্যিই তাই। বিকেল বেলায় উজলরাম এসে বললে সহিস ইব্রাহিমের কলেরা মতন হয়েছে। শুনে তখনই তাকে হাঁসপাতালে পাঠানোর আদেশ দিলুম, এদিকে এরা দুজন যে তাকে নিয়ে আগলে বসেছে তা আর কে জানে!"

বীণা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল—"কলেরা? কি সর্ব্বনাশ, এক মিনিট বাড়ীতে রাখবেন না মা, শিগ্‌গীর বিদায় করুন। উঃ, ওর মত মারাত্মক সংক্রামক ব্যারাম আর আছে কিনা সন্দেহ।"

কথাটা বলিয়াই সে মুখখানা অতিরিক্ত রকম বিকৃত করিয়া ফেলিল। নিজে সে ডিসপেপসিয়ায় বড় বেশী রকম কষ্ট পাইতেছিল, তাই কলেরার নাম শুনিয়া তাহার ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল।

ইলা সে দিকে নজর করিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "দু জন কে মা?"

বিকৃতমুখে শোভনা বলিলেন, "কল্যাণী আর যতীন্দ্র। যতীনকে বারণ করলুম, একটা উত্তর দিলে না, শুধু মুখের পানে খানিক তাকিয়ে থেকে চলে গেল। উজলরামকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম এরা দুজনেই বাগানের চালাটায় ইব্রাহিমকে বয়ে নিয়ে গেছে।"

বীণা আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাগানে—তবুও ভাল, খানিকটা দূর আছে।"

ইলা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়াছিল, অন্তর তাহার কোন দিকে যাইতে চাহিতেছিল তাহা সেই জানে।

শোভনা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই আবার থমকে দাঁড়ালি কেন? উঠে আয়, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আরতি দেখাবার জন্যেই বীণাকে নিয়ে যাওয়া, আরতি হয়ে গেলে কি দেখবে?"

অগত্যা ইলাকে উঠিতেই হইল।

দলটী যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। উপরে উঠিতে উঠিতে ইলা যতীনের গৃহের দিকে তাকাইয়া দেখিল গৃহ

মধ্যে আলো জ্বলিতেছে যতীন গৃহে নাই, সম্ভব সে বাগানে ইব্রাহিমের কাছে রহিয়াছে।

শোভনা রুক্ষকণ্ঠে আপনা আপনি বলিতেছিলেন, "এই সব নোংড়া রোগ ঘেঁটে বাড়ীময় এর বিষটা ছড়িয়ে দেবে তা বুঝতে পারছি। যতীন আর যাই করুক, আমার অমতে কখনো এ রকম নোংড়ামী কাজে হাত দিতে পারত না, কেবল কল্যাণীর হুজুকে পড়েই গেছে। এতকাল ওই মণি মাষ্টার থেকেও ওকে অমন করে তুলেছিল, যদি ও মাষ্টারকে না রাখা হতো যতীনকে ঠিক আপনার করে নিতে পারতুম। ভাবলুম সে আপদটাকে দূর করেছি এবার যতীনকে খুবই কাছে পাব, কিন্তু কল্যাণী এসে আবার সব বিগড়িয়ে দিলে। এদের নিয়ে যে কি করব তাই আমি ভেবে পাচ্ছি নে। উনিও সেই বিকেলে আজ বেরিয়েছেন, বাড়ীতে থাকলেও যা হয় একটা বিহিত করতে পারতেন। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপছে, মা দুর্গা সব দিক রক্ষা করুন, আমি কালিঘাটে পূজো পাঠিয়ে দেব।"

বীণার মুখে হাসি ভাসিয়া উঠিল, সে ইলার গায়ে একটা টিপুনি দিল কিন্তু ইলা আজ কথা কহিল না। অন্যদিন হইলে এই সব ব্যাপার লইয়া সে অনেক হাসিত, অনেক কথা বলিত, আজ সে নির্ব্বাক। অন্তর তাহার মায়ের কথায় সায় দিয়া যাইতেছিল—মা রক্ষা কর, মুখে সে একটা কথাও ফুটাইতে পারে নাই।

বীণা আজ তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িল। ইলা কাপড় জামা ছাড়িয়া গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় পাদচারণা করিতে লাগিল। বীণা তাহাকে

ডাকিয়া বলিল, "রাত অনেক হয়েছে ইলা, এখন আর বেড়াতে হবে না, এসে শুয়ে পড়।"

ইলা বলিল, "তুমি ঘুমোও বীণা, আমি খানিক বেড়িয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ব এখন।"

সপ্তমীর ক্ষীণ চাঁদ তখন অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছে, অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ধরাবক্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। নীল আকাশের গায়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি জ্বলিতেছে, তাহার মৃদু আলো সামান্য দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে মাত্র।

প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের মধ্যে পথের শুভ্র আলো আসিয়া পৌছাইতে পারে নাই। বাগানের মাঝখানে যে আলোটা সন্ধ্যা হইতে জ্বলিত, প্রচলিত নিয়মানুসারে বাগানের মালী রাত্রি দশটার সময় তাহা নিভাইয়া দিয়াছে। বাগানের একপ্রান্তে বিশ্রামের ছোট চালাখানি, ইহাতে খানকত বেঞ্চ পাতা ছিল। ইব্রাহিমকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার প্রস্তাবে আপত্তি তুলিয়া কল্যাণী যতীনের সাহায্যে বেঞ্চ কয়খানি বাহিরে ফেলিয়া একখানি ছোট তক্তাপোষ সেখানে লইয়া গিয়াছে, তাহারই উপর রোগীকে শুয়াইয়া নিজেরা পরিচর্য্যা করিতেছে। মেঝেয় দুইটী লণ্ঠন রহিয়াছে, তাহার আলোকে সবই দেখাযাইতেছে।

ইলা দ্বিতলের রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। সার্থক কল্যাণীর নারীজন্ম, সে জগতে কাজ করিতে আসিয়াছে, কাজ করিয়া যাইবে, ইলা কি করিতেছে? শিক্ষার অহঙ্কারে স্ফীতা সে, জগতে আসিয়াছে অসার আমোদ প্রমোদে ভুলিয়া থাকিবার জন্য, ইহাতে নারীত্বের বিকাশ হইতে পারিল কই?

"আর—আর একজন যে আছে—"

ইলা দেখিতেছিল যতীনের মুখে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি মুর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত সে নারীর নিকট হইতে শাসন ও অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু পায় নাই, তাহার প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিয়াছিল, শিক্ষিতা মেয়েরা সংসারের যথার্থ কোন কাজে আসিতে পারে না, ইহারা অলস ভাবেই জীবনটা কাটাইয়া দেয়। সে সম্মুখে দেখিতেছিল তাহার শিক্ষিতা অভিমানিণী শ্বাশুড়ীকে, অহঙ্কারে স্ফীতা স্ত্রীকে, হৃদয় তাহার স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তাই সে কোন দিনই ইহাদের নিকট কিছু চায় নাই, স্বেচ্ছায় নিকটে পর্য্যন্ত আসে নাই। আজ কল্যাণীকে সে পার্শ্বে পাইয়াছে, শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যেও যে প্রকৃত মহত্ব, নমনীয়তা কমনীয়তা থাকিতে পারে তাহা সে দেখিয়াছে, তাই তাহার লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। ভাই যেমন ভগিনীর সাহায্য করে সে তেমনি ভাবে কল্যাণীর সাহায্য করিতেছিল, তাহার মধ্যে জড়তা এতটুকু ছিল না।

"ভগবান—"

ইলার দুটি চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল, সে দুইহাত বুকের উপর রাখিয়া উর্দ্ধনয়নে চাহিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, আমায় আজ সত্যকেই দেখতে দিয়েছ মা, এইরূপই আমি দেখতে চেয়েছিলুম, দেখতে পাইনি বলে জাগাবার জন্যে অনেক আঘাতই দিয়েছি; মা সতীরাণী, তাতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে আমায় মার্জ্জনা করো।"

আজ যথার্থ সে শান্তি পাইল, মুখ ফিরাইয়া দেখিল যতীন নত হইয়া মেজার গ্লাসে ঔষধ ঢালিতেছে। সে উদ্দেশে স্বামীকে

প্রণাম করিল, তাহার পর চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বীণার তখন বেশ ঘুম আসিয়াছে, ইলার দরজা বন্ধ করার শব্দে নড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "সন্ধ্যেবেলায় ভগবানকে ডাকতে পাস নি, এখন তাই ডাকছিলি বুঝি ইলা ?"

আলো নিভাইয়া দিয়া নিজের বিছানায় কাত হইয়া পড়িয়া ইলা উত্তর দিল, "তাই বটে, এতদিন যা প্রার্থনা করেছিলুম, আজ তা পেয়েছি তাই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলুম।"

কথাটা বীণার কানে পৌঁছিবে না বলিয়াই সে সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল।

"বউ মা— ?"

সাবিত্রী ঘাটে গিয়াছিল, নারায়ণীর আহ্বান কানে গেল না। নারায়ণীর আর উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। জোর করিয়া উঠিতে গেলেও পড়িয়া যান, সাবিত্রী তাঁহাকে মোটেই নড়িতে দিত না।

সাবিত্রীর পিত্রালয় হইতে উপর্য্যোপরি পত্র আসিতেছিল, সে এক খানি পত্রেরও উত্তর দেয় নাই। সাবিত্রীর মা মেয়েকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতাও বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সাবিত্রী নড়িতে চাহে না। একদিন কালো বলিয়া সেখানে সে যে অবজ্ঞাতা হইয়াছিল, তাহা তাহার মনে এখনও জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল। অনেকদিন আগে মায়ের একখানা পত্রের উত্তরে সে লিখিয়াছিল—তুমি তো একদিন নিজের মুখেই বলেছিলে মা, কালো যারা তাদের মরণই ভাল, আবার কেন কালো মেয়েকে পেতে চাও মা ? মনে কোরো তোমার মেয়ে নেই, সে মরে গেছে।"

অভিমানে হৃদয় তাহার পূর্ণ হইয়াই ছিল, পিত্রালয়ের চোখে স্বেচ্ছায় সে লুপ্ত হইয়াছিল।

আজ পাঁচ ছয় মাস হইতে রবীনের কোনও সংবাদ নাই। ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে সে ফিরে নাই, মা তাহাকে কত মাথার দিব্য দিয়া, কত কাঁদিয়া কাটিয়া পত্র দিয়াছেন, সে মাকে বুঝাইয়া লিখিয়াছিল আর

এক বৎসর পরে ডিসেম্বর মাসে সে বাড়ী ফিরিবে, কারণ সে সাত বৎসরের জন্য আসিয়াছে, ইহার মধ্যে ফিরিতে পাইবে না।

মাসে মাসে সে যে টাকা পাঠাইত, তাহাতে নারায়ণীর আহার বা ঔষধের অভাব হয় নাই। পাঁচ ছয় মাস হইতে তাহার টাকাও আসে নাই, পত্রও আসে নাই। নারায়ণী অনেক পত্র দিয়াছেন, রবীনের উত্তর আসে নাই।

কোথায় সে দেশ,—কতদূরে—কে তাহার সন্ধান আনিয়া দিবে? মাতৃহৃদয় বেদনার কষ্টে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। কে জানে তাহার কি হইল—ভাল আছে কিনা তাই বা কে বলিতে পারে? এতো কলিকাতা নয় যে—যে-সে খবর দিতে পারিবে? এ দেশ কোথায় তাহার খোঁজ পল্লীগ্রামের লোক রাখে না।

নারায়ণী বিছানায় পড়িয়া চোখের জলে ভাসিয়া গ্রাম্যদেবী মঙ্গল-চণ্ডীর কাছে পূজা মানিলেন, গোবিন্দজীর পূজা মানিলেন, কিন্তু কেহই মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

যতীনের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইত। আহা থাক, সে সুখে থাক। এখানে না আসুক, তাঁহাকে মা বলিয়া না ডাকুক, তিনি তো জানিতেছেন সে সুখে আছে, ভাল আছে, সেই সংবাদটুকুই যে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

তিনি জানিতেছিলেন এবার তাঁর বাঁচিবার আশা নাই; অনেক আগেই তাঁহার যাইবার কথা ছিল—রবীনের প্রেরিত অর্থ ও সাবিত্রীর বুকভরা স্নেহ সেবা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এতদিন সাবিত্রী যেমন করিয়া পারিয়াছে তাঁহার পথ্য খরচ যোগাইয়া আসিয়াছে, এইবার সেও চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছে, তাহার হাতে আর একটী পয়সা নাই, ঘরেও কিছু নাই—যাহা বিক্রয় করিয়া সে পথ্য যোগাইতে পারে।

একবার মুহূর্ত্তের তরে যতীন ও ইলাকে দেখিবার শেষ ইচ্ছা নারায়ণীর মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। পুত্রবধূরূপে ইলাকে তিনি চোখে দেখিতে পান নাই, বিবাহিত পুত্রকে তিনি একটী দিনের জন্যও কোলে ফিরিয়া পান নাই। যতীনের প্রথম পাশ করার খবর সুধীন যে দিন নিয়া গিয়াছিল, সে দিন তিনি আনন্দে চোখের জল ফেলিয়া, রুগ্নদেহ লইয়াও পূজা দিতে মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে গিয়াছিলেন। মনের এক কোনে একটু ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে নিজে একখানি পোষ্টকার্ডে এই কথাটা লিখিয়া মাকে জানাইতে পারিল না? তখনি তিনি সে ক্ষুব্ধতাকে চাপিয়া ফেলিয়াছিলেন—না জানাক, তিনি তো জানিয়াছেন।

সাবিত্রীকে যখন তিনি যতীনের শ্বাশুড়ীকে একখানা পত্র লেখার কথা বলিলেন, তখন সে ফোঁস করিয়া উঠিল—"না মা, সেখানে আর আপনি পত্র লিখতে পাবেন না। বার বার কেন এমন করে যেচে অপমান নিতে যাচ্ছেন মা? আপনি নিতে চাইলেও আমি যতক্ষণ আপনার কাছে থাকব, কিছুতেই আপনাকে নিতে দেব না। আগে বুঝতে পারিনি তাই আপনার আদেশে সেখানে পত্র দিতুম, এখন আর কিছুতেই দেব না।

জমিদার বাড়ীর অনেক কথা সে শুনিতে পাইয়াছিল। ও পাড়ার মোক্ষদা ঠাকুরাণী জমিদারের কলিকাতার বাসায় রন্ধন করিতেন, মাঝে

মাঝে এক আধ দিনের জন্য দেশে আসিতেন। সেবারে সেখানকার ব্যাপারগুলা নারায়ণীকে সবিস্তারে শুনাইবার জন্যই তিনি আসিতে-ছিলেন, সাবিত্রী পথিমধ্যে তাঁহাকে পাকড়াও করে। রাগের মাথায় সাবিত্রীর সম্মুখেই পেটের কথা সবই তিনি ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া নারায়ণীকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন, "ছি ছি, এমন করেও কেউ ছেলে দেয় মা? ছেলেটাকে কত না কথাই শুনতে হয়, নেহাৎ ছেলে-মানুষ বলেই মুখ বুজে শুনে যায়—বড়লোকের ঘরে সুখের আস্বাদ পেয়েছে কিনা—তাই, নইলে আর কেউ হলে ক-বে বেরিয়ে পড়ত।"

সাবিত্রী তাঁহার হাত দুখানা ধরিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছিল—এ সব কথা মার কাছে কিছু বলো না ঠাকুর মা, আমার মাথার দিব্যি রইল, মা যা জানছেন তাই ভাল, এ সব কথা শুনলে তিনি, কেঁদে কেটে একাকার করবেন, রাগের মাথায় সেখানে কি লিখতে কি লিখে বসবেন, একটা তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। মাকে সোজাসুজি বলো, ঠাকুর পো খুব সুখে আছে, ভাল আছে, সময় পায়না বলিয়াই পত্র দিতে পারে না।"

নারায়ণী কাঁদিবেন সে কথার জন্য নয়—রাগিয়া সেখানে পত্র দিবেন ও একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাইবে, এই কথা শুনিয়াই মোক্ষদা চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে কথাটা পৌছাইলে সংবাদ দাতার নাম প্রকাশ হইয়া পড়িবে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইবে মাঝে হইতে প্রাণ যাইবে তাঁহার,—অতএব দরকার নাই, কোন কথায়।

নারায়ণীর প্রস্তাবে সাবিত্রী যখন কিছুতেই মত দিল না তখন—একদিন-সে ঘাটে গেলে তাহার অজ্ঞাতে তিনি পাড়ার একটী ছেলেকে

দিয়া শোভনাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি পত্র দিলেন।

দিন সাত বাদে পত্রের উত্তর আসিল, সে পত্র পড়িল সাবিত্রীর হাতে। শোভনা অকারণ ঔদ্ধত্য অনেক দেখাইয়াছেন, তাঁহার কন্যাকে তিনি পাঠাইবেন না জানাইছেন, তবে জামাতা যদি যাইতে ইচ্ছা করে তবে একেবারেই যাইতে পারে, ভবিষ্যতে শ্বশুরালয়ের সহিত তাহার আর কোন সম্পর্কই থাকিবে না।

পত্র শুনিয়া নারায়ণী আড়ষ্টভাবে হাত দুখানা মুখের উপর চাপা দিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁহার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সাবিত্রী সেখানে তাহার অজ্ঞাতে পত্র লেখার সম্বন্ধে আর একটীও কথা বলিতে পারিল না।

আঘাতে আঘাতে ও রোগের যন্ত্রণায় নারায়ণীর সেই শান্ত কোমল প্রকৃতি কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য একটু কারণেই তিনি অকারণ রুক্ষ হইয়া উঠিতেন, এ সময়ে তাঁহার মুখের কোন আবরণ থাকিত না, যাহা খুসি বলিয়া যাইতেন, সাবিত্রী নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইত।

তাহার সকল ব্যথায় সান্ত্বনাদায়িনী ছিল মেধা, বিবাহের পর এক বৎসর না যাইতেই অভাগিনী মেধা সিঁথীর সিন্দুর মুছিয়া, হাতের লোহা খুলিয়া মা বাপের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছিল। মেধার মা জামাতার শোক সহ্য করিতে পারেন নাই, দু তিন মাস না যাইতেই তিনিও মৃত্যু পথের যাত্রী হইয়াছেন। মেধার পিতা শিবনাথ ভগ্নহৃদয় লইয়া আর কলিকাতায় থাকিতে পারেন নাই, দোকান তুলিয়া দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

মেধা অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছিল, থান পরিয়াছিল, মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তাহাকে বিধবার সাজে সজ্জিত হইতে দেখিয়া নারায়ণী রুদ্ধকণ্ঠে বিজয়াকে বলিয়াছিলেন, "ওকে এখনই এ সাজে সাজালে কেন ভাই, এর পর নিজেই নিজের সাজ বেছে নেবে। এখন ওকে অমন করে সাজিয়ো না।"

বিজয়া অশ্রুভরা চোখে বলিয়াছিলেন, "ও যে নিজেই সব খুলে ফেলেছে দিদি, বামন কায়স্থের ঘরের বিধবা যেমন সকল আচার মেনে চলে, মেধাও তেমনি ভাবে চলছে। আমি ওকে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছি দিদি, ও কিছুতেই ওর জেদ ছাড়বে না।

বাস্তবিকই মেধা মেয়েটী বাল্যাবধি বড় একজেদী ছিল, ইহারই জন্য পিতা মাতার কাছে না হোক—যতীনের কাছে তাহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, তবু এই স্বভাব সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই।

মেধা এখনও আগেকার মতই এ বাড়ীতে আসিত, ধরিতে গেলে এ সংসার এখন তাহার সাহায্যেই চলিতেছিল। সাবিত্রী কিছুতেই নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারিত না, তাহার শুষ্কমুখ দেখিয়াই চতুরা মেয়েটী চট করিয়া বুঝিয়া লইত।

পূর্ব্বদিন হইতে গৃহে কিছুই ছিল না, মেধাও কয়দিন এখানে নাই, পিতার সহিত সে মাতুলালয়ে গিয়াছে, সাবিত্রী ভাবিয়া পাইতেছিল না এখন সে কি করিবে। আজ কাল নারায়ণীর সকাল বেলাই ক্ষুধা হয়, সাবিত্রী তাড়াতাড়ি করিয়া খানিকটা বার্লি করিয়া, তাহাতে লেবুর রস ও লবণ দিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে গিয়াছিল, দুই চুমুক

মাত্র খাইয়া তিনি বাটীটা, সাবিত্রীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন—ইহাতে চিনি দেওয়া হয় নাই কেন সেই কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন।

কৈফিয়ৎ সাবিত্রী কি দিবে; সে যে কত কষ্টে সংসারের অভাবের কথা এই রুগ্নার কাছে গোপন রাখিয়াছে তাহা সেই জানে আর জানেন ভগবান। মেধা যাহা যাহা কিনিয়া দিয়াছিল সবই ফুরাইয়া গিয়াছে, সে এখন কাহার কাছে গিয়া হাত পাতিবে।

চোখের জল চোখে চাপিয়া সে নীরবে বাটীটা কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। চোখের জল আর তাহার মানা মানিল না—ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল, কণ্ঠে একটী শব্দ মাত্র ফুটিল,—"মা—"

রন্ধনগৃহের কোনে একটী মাটীর কলসী ছিল, সেইটা তুলিয়া লইয়া বাসন কয়খানা লইয়া সে ঘাটে চলিয়া গেল, কেননা গরীবের ঘরে ব্যথা সামলাইবার বা চোখের জল ফেলিবার সময়টুকুও মিলে না।

নারায়ণী রুদ্ধরোষে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

মানুষের কিছুই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, রাগ শোক সবই মিলাইয়া যায়, নারায়ণীর ক্রোধও খানিক বাদে পড়িয়া আসিল।

সাবিত্রীকে তিনি এ পর্য্যন্ত কত তিরস্কারই না করিতেছেন, কত লাঞ্ছনাই না দিতেছেন, সে সবই সে মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইতেছে, একটা দিন একটা উত্তর সে করে নাই, সে কিসের জন্য এখানে এত কষ্ট করিয়া পড়িয়া আছে, স্বামী তাহার থাকিয়াও নাই, এখানে নিত্য অনাটন, পিত্রালয়ে গিয়া সে থাকিলেও তো পারে। সেখানে তাহার অভাব কিসের? মা, বাপ, ভাই, বোন, সবই তাহার আছে, এখানে

কাহার জন্য সে এত দুঃখ কষ্ট সহিয়া পড়িয়া থাকে,—শুধু তাঁহার জন্যই নহে কি ?

তাহাকে যে দিন দিন কতখানি করিয়া বেদনা দিতেছেন তাহা মনে করিয়া নারায়ণীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। না, তাঁহার তো যাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনও কি তিনি এমনিই অবুঝ থাকিবেন ? বধূকে ডাকিয়া তাহার বেদনা দূর করিবার জন্য প্রাণটা তাঁহার বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক বাদে সাবিত্রী ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিল। বাটী ঘটি রাখার শব্দ শুনিয়া নারায়ণী ডাকিলেন, "বউমা, একবার এ দিকে এসো তো মা ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ইদানিং মোটেই কোমলতা ছিল না, আজ সেই স্বরের পরিবর্ত্তন শুনিয়া সাবিত্রী আশ্চর্য্য হইয়া গেল ; তাড়াতাড়ি সে বাসন রাখিয়া নারায়ণীর নিকটে আসিল।

"এ দিকে এসো মা, আমার বিছানার ধারে এসো, একটা কথা শোন।"

সাবিত্রী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিল, তাঁহার ললাটে হাত দিয়া দেখিতে গেল জ্বরটা আছে কিনা। নারায়ণী তাহাকে শীর্ণ দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অশ্রুসজল চোখে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বউমা, আজ তোমায় বড় ব্যথা দিয়েছি মা, আমায় ক্ষমা কর। কি বলতে কি বলি, কি করতে কি করে ফেলি তার কিছু ঠিক নেই, রোগে আমায় অপদার্থ করে ফেলেছে। হ্যাঁ, মা, এতে তুমিও যদি রাগ কর তা হলে——"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্যস্ত হইয়া তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে সাবিত্রী বলিল, "ও কি কথা বলছেন মা, আমি আপনার 'পরে রাগ করব কেন, আপনি কি করেছেন যাতে আমি দুঃখ পাব ?"

নারায়ণী তেমনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমি যে বার্লি খাইনি মা, বাটী ফেলে দিয়েছি—,"

আশ্বস্ত হইয়া হাসিমুখে সাবিত্রী বলিল, "ওঃ, এই কথা, কিন্তু মা, এতে আমারই যে দোষ রয়েছে, আপনারই তো এতে রাগ হওয়ার কথা।"

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি দোষ রয়েছে মা ?"

সাবিত্রী মুখনত করিয়া চাপাস্বরে বলিল, "আমি আজ বার্লিতে চিনি দিতে পারি নি যে মা। আপনি লেবু নুণ খেতে পারেন না, খেতে চান না জেনেও তাই দিয়েছিলুম—,"

বড় ব্যথাভরা হাসির মলিন রেখা নারায়ণীর মুখে ভাসিয়া উঠিল,—ওরে মা, সব জেনে শুনেও আমি যে জানতে শুনতে চাইনে এ কি আমারই দোষ নয় ? আমিই যে নিজের হাতে সব ঘুচিয়েছি পাগলী ! রবীন যখন সেখানে যেতে চাইলে আমি যদি মত না দিতুম, সে তো যেতে পারত না, তা.হলে তো তাকে এমন করে হারাতুম না। তখনও সে আমার বাধ্য ছেলে ছিল, তখনও সে আমার অনুমতী নিয়ে কাজ করত তাই জানতে এসেছিল। প্রথমে অমত করে-ছিলুম, তারপর টাকার প্রলোভনে আমি ভুলে গেলুম, আমি মত

দিলুম—তাই না সে যেতে পারলে? যদি না যেতে দিতুম তা হলে সে তো কলকাতাতেই থাকত। এই ছোট ছেলেকে ছেড়ে দিলুম—যাক—সে তো মানুষ হবে—আমার কপালে যাই থাক, হাতের ঢিল ছেড়ে দিয়েছি, সে ঢিল আর কি ফেরে মা? নিজের দোষে সব হারিয়েছি, নইলে আজ আমার দুঃখ ছিল কিসের? জানি ঘরে কিছু নেই, জানি মা আমার—কাল একবেলাও তুমি পেটভরে ভাত খেতে পাওনি—তবু—তবু আমি চিনির মিষ্টি স্বাদ না পেয়ে কেন রাগলুম, কেন বাটী ফেলে দিলুম? মা গো মা, আমার মত কপাল আর যে কারও হয় না, তবু তো মরণও হয় না, যম সবাইকে নেয়, আমায় তো নেয় না।"

নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া নারায়ণী কাঁদিতে লাগিলেন।

"মা—মা, অমন করে কাঁদবেন না মা-

কান্নাভরা সুরে নারায়ণী বলিলেন, "কাঁদব না—আর কত কান্না চেপে রাখতে বল বউ মা? কান্নার বোঝায় আমার বুক বড় ভারি হয়ে উঠেছে, এত বোঝা আমি টেনে নিয়ে অনন্তের পথে চলতে পারব না, আমায় কেঁদে কতকটা পাতলা হতে দাও। বউমা, আজ ছয় মাস রবীনের কোন খবর পাইনি, ছয় মাস সে—"

সাবিত্রী অধর দন্তে চাপিয়া আড়ষ্টভাবে খানিক বসিয়া রহিল, বুকের মধ্যটা তাহার অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতেছিল। কথা আর গোপন থাকে না, বাহির হইয়া পড়িতে চায় যে।

"মা, আপনার বড় ছেলের—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অশ্রুসিক্ত দুইটী চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া নারায়ণী বলিলেন, "কি বলছো মা ?"

মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইয়া সাবিত্রী বলিল, "আপনার বড় ছেলেব খবর পেয়েছি।"

"পেয়েছ—রবীনের খবর পেয়েছ? এ কথা আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছ কেন বউমা, কেন সে কথা আমায় জানাও নি ?"

স্থির চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া সাবিত্রী বলিল, "দরকার হয় নি বলে মা, আমি আপনার ব্যাকুলতা দেখে তাঁর খবর জানবার জন্যে আমার দাদাকে এতকাল পরে পত্র দিয়েছিলুম, তাঁর পত্র কাল পেয়েছি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে নারায়ণী বলিলেন, "কেমন আছে সে—ভাল আছে তো বউমা? সে যে এই ছয় সাত মাস পত্র দেয় নি কেন তা কিছু জানিয়েছে কি ?"

নিঃশ্বাস গোপন করিয়া সাবিত্রী বলিল, "আজ ছয় মাস হল আপনার বড় ছেলে একটী বার্ম্মিজ মেয়েকে বিয়ে করে রেঙ্গুনে চলে গেছেন, শুধু এই খবরটুকুই শোনা গেছে, এর বেশী আর কোন খবর দাদা পান নি।"

নারায়ণী হাতখানা দুই চোখের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আর একটী কথাও বাহির হইল না।

সাবিত্রী ভয় পাইয়া তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল "মা—"

"ভয় নেই বউমা, এ খবরটা পাওয়ার জন্যেই এখনও বেঁচে আছি, এখনও মরি নি। যাও বউমা, তোমার কাজ বাকি আছে শেষ করে ফেল গিয়ে, আমার কাছে থাকবার আর দরকার নেই।"

তাঁহাকে আর বিরক্ত না করিয়া সাবিত্রী উঠিয়া পড়িল।

---

(১৮)

কয়েক দিন পরে মেধা ফিরিয়া আসিল। সাবিত্রীর বুকেও ভরসা আসিল, নারায়ণীকে লইয়া সে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। সেই দিন হইতে নারায়ণী কি প্রলাপ বকিতেছেন, সে মোটেই বুঝিতে পারিতেছে না।

মেধা অবস্থা দেখিয়াই ভয় পাইল, বলিল, "এ যে বিকার হয়েছে বউদি, মাসীমা বুঝি এইবার আমাদের ছেড়ে চলে যান।"

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সাবিত্রী বলিল, "এখনও যদি যেতে পারেন মেধা, সেও ভাল হয়। বাঁচলে হয় তো আরো আঘাত সইতে হবে, তার চেয়ে সরে যাওয়াই ভাল। এতে আমাদের কষ্ট হবে কিন্তু ওঁর প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।"

মেধা ভাঙ্গাস্বরে বলিল, "এর চেয়ে আর কি আঘাত বেশী করে প্রাণে বাজতে পারে বউদি? আমি এখনই ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি, যতক্ষণ বাঁচবেন আমাদের চেষ্টা করতে হবে, তারপর যা ঘটবার তাই ঘটবে।"

ডাক্তার আসিলেন, রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। মেধার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া বলিল, "মা আমাদের ছেড়ে চললেন মেধা, জ্যোতিষির গণনাই সার্থক হল, দুই ছেলের মধ্যে কেউই রইল না যে তাঁর মুখে একটু গঙ্গাজল দেয়।"

মেধা গোপনে চোখ মুছিয়া বলিল, "এখন কাঁদবার সময় নয় বউদি, এর পরে কেঁদো, এখনকার কাজ তুমিই কর, ছেলের হাতের জল না পান তোমার হাতের জল তো পাবেন।"

সাবিত্রী নারায়ণীর মাথা কোলে লইয়া বসিল।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বৃদ্ধা চোখ মেলিলেন, ব্যাকুল নেত্রে একবার চারিদিকে চাহিলেন, কম্পিত ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া একটী মাত্র শব্দ বাহির হইল—"যতীন—"

মেধা চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সবই ফুরিয়ে গেল বউদি, নামিয়ে দাও কোল হতে।"

বাড়ীটা যেন শূন্য হইয়া গেল। প্রতিবাসিগণ পরামর্শ দিলেন যতীনকে এখনই সংবাদ দেওয়া উচিত। মায়ের মুখাগ্নি সে না করুক, শ্রাদ্ধ তাহাকেই করিতে হইবে, পুত্র থাকিতে আর কেহ শ্রাদ্ধাধিকারী হইতে পারে না।

সাবিত্রী তাঁহাদের বিধানই মানিয়া লইল এবং তখনই পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল।

তখন যতীন কলিকাতায় ছিল না, কল্যাণীর সাদর নিমন্ত্রণে দার্জ্জিলিং গিয়াছিল। ইলা কলিকাতায় ছিল, তাহার শরীর ভাল ছিল না বলিয়া সে তখনকার মত কল্যাণীর সহিত যাইতে পারে নাই।

সাধারণ পোষ্টকার্ডে লেখা পত্র, সামান্য দুই চার লাইন লেখা মাত্র। পত্রখানি প্রথমতঃ উমাপতি বাবুর সম্মুখে পড়িল, তিনি সেখানা ভিতর বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রচুর দোক্তাসহ পান চর্ব্বণ করিতে করিতে শোভনা বলিলেন, "যাক্ আপদ গেছে। মাগী মরেছে—তারও শান্তি আমাদেরও শান্তি। যতীনের মনে ওই মায়ের জন্যে শান্তি ছিল না, তা হওয়ারই কথা, হাজার হোক মা তো বটে। তা শেষটা একবার দেখা হল না এই যা দুঃখের কথা। আমি তো সেই চিঠিখানা পাওয়ার পরে বলেছিলুম—যাও বাপু, একবার দেখা করেই এসো, না গেলে আমার কি দোষ।"

ইলা কার্ডখানা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, তাহার মুখের ভাবটা বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে বেশ জানিত তাহার মা কি রকম মুখ করিয়া যতীনকে সেখানে যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, যতীন যায় নাই সেটা ভাল হইয়াছে বলিয়া তখন সে মনে করিয়াছিল, এখন সে দেখিল না যাওয়াটা অন্যায়ই হইয়াছে, না যাওয়ার জন্যই মায়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইল না। যে গিয়াছে সে যেমন বেদনা বহিয়া কাঁদিয়া গিয়াছে, যে রহিয়াছে তাহার বুকেও এই ক্ষতটা চিরকাল জাগিয়া থাকিবে; এ ক্ষততে প্রলেপ দেওয়ার মত সান্ত্বনা আর কিছুতেই নাই।

তাহার কঠিন মুখখানার পানে তাকাইয়া শোভনা বলিলেন, "চিঠিখানা পড়া তো হয়েছে ইলা, এখন ছিঁড়ে ফেলে দে, ও মরা খবরের চিঠি ঘরে রাখতে নেই।"

ইলা একটু কঠোর ভাবেই বলিল, "ছিঁড়ে ফেলব কি, যার চিঠি তাকে দিতে হবে না?"

শোভনা বলিলেন, "চিঠি আর দিতে হবে না, যখন আসবে তখন মুখে

বললেই হবে। আর—বলেই বা কি হবে, কোন ফলই হবে না—এক শোক করা ছাড়া।”

“কিন্তু মা, ফল যথেষ্ট হতো যদি আগে দেখা করতে যেতে দিতে—”

রুক্ষ হইয়া উঠিয়া শোভনা বলিলেন, “তুই কি ভাবিস ইলা আমি তাকে যেতে দেই নি? তার খুসি হলে সে যেতে পারত। সে নিজেই তো গেল না—এতে আমার কি দোষ?”

ইলা রুক্ষকণ্ঠ সংযত করিয়া বলিল, “না তোমার দোষ শুধু নয় মা, দোষ তারও আছে। পরের পরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া যাকে বলে, ঠিক তাই হয়েছে আর কি? তোমাদের ’পরে রাগ করেই সে মাকে দেখতে যায় নি; কিন্তু এতে ক্ষতিটা কার হল—তার নয় কি? সে যদি তোমাদের কঠোর শাসন উপেক্ষা করেও যেত—বুড়া মা তার জেনে যেতে পারতো না তাঁর ছেলে থেকেও নেই। এর বেশী কষ্টের কথা আর কি থাকতে পারে মা যে—”

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া শোভনা বলিলেন, “থাম—থাম ইলা, তুই আর অতটা কথা বলিস নে, তোর মুখে ও সব কথা আমার সহ্য হয় না। তোকেও যে যেতে বলেছিল, গেলেই পারতিস তো, যাস নি কেন?”

ইলা এবার যথার্থই চটিয়া উঠিল, বলিল, “সে কথাটা আমায় তো কেউ জানাও নি মা, যদি জানাতে তবে যেতুম কিনা দেখতে।”

রাগ করিয়া সে নিজের গৃহে চলিয়া গেল।

শোভনা অবাক হইয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন, মেয়ে যে কল্যাণীর সঙ্গে থাকিয়াই এমন বিকৃত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি মুক্তকণ্ঠে ইহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না।

রাখাল অন্তঃপুরে আসিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "বাবু বলে দিলেন দিদিমণির হবিষ্যি করতে হবে, তার কি কি দরকার—"

ভীষণ একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া শোভনা বলিলেন, "হবিষ্যি করবে কি? ও কি শ্বশুর বাড়ী ঘর করতে গেছে, সেখানকার অন্ন একটাও দাঁতে কেটেছে যে ওকে হবিষ্যি করতে হবে? হবিষ্যি করবে গাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েরা, আমি ওকে ও সব করতে দেব না। আতপ চালের ভাত—আলুভাতে—এই সব অখাদ্য নাকি মানুষে খায়?"

ধমক খাইয়া রাখাল পলাইল, ইলার হবিষ্যের কোন উদ্যোগই হইল না।

ইলা ক্ষিপ্রহস্তে কল্যাণীকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইল, অপরিচিত প্রায় স্বামীকে পত্র লিখিতে তাহার কি রকম সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, সেইজন্য সে যতীনকে পত্র দিতে পারিল না। পত্রখানা পোষ্ট করিতে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

রাঁধুনী মোক্ষদা গৃহমধ্যে একবার উঁকি দিল—শোভনা সেখানে নাই দেখিয়া নির্ভয়ে সে প্রবেশ করিল।

ইলা মোক্ষদার নিকট গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত, এবারেও কল্যাণী ও বীণাকে সে মোক্ষদার গল্প শুনাইয়া ছাড়িয়াছে। মোক্ষদা শোভনাকে ভয় করিত, ইলাকে ভালবাসিত। শোভনাকে দেখিবামাত্র গল্প থামিয়া যাইত, কেননা শোভনা এই ধরণের রূপ কথা মোটেই পছন্দ করিতেন না, তাঁহার মনে ধারণা ছিল এই সব ব্যাঙ্গম ব্যাঙ্গমী, ভুত পেত্নী অথবা রাক্ষস রাক্ষসীর গল্প ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া ফেলে।

ইলা মোক্ষদাকে দেখিয়াই চাপিয়া ধরিল, "এই যে মোক্ষদা মাসী, আমি তোমার সন্ধানে রান্নাঘরে যাব ভাবছিলুম, বল দেখি, আমায় এখন কি করতে হবে ?"

যদিও মোক্ষদা সবই জানিত তথাপি শোভনার ভয়ে চাপিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "তোমায় আবার কি করতে হবে মা, কিছুই করতে হবে না ?"

ইলা বলিল, মিথ্যে কথা বলছো মোক্ষদা মাসী, সেদিনে একটা গল্প করেছিলে তাতে বলেছিলে শ্বশুড় শ্বাশুড়ী মারা গেলে ছেলের বউকে কি কি করতে হয়; আজ বলছ না কেন মোক্ষদা মাসী ? শুনেছ তো আমার শ্বাশুড়ী মারা গেছেন, এখন আমি কি করব বলে দাও দেখি। তোমরা যে রকম কর আমাকেও তো তেমনি করতে হবে, আমি যে কিছুই জানিনে ?"

মোক্ষদা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, "ও কথা বলো না মা, সে সব করতে বড় কষ্ট হয়, তোমরা কি সে সব পারো ? চিরকাল সুখে কাটিয়ে আসছ, এমন ভাল ভাল তরকারী তাই খেতে পার না— আর সেই আতপ চালের ভাত, ডাল আলু সিদ্ধ একপাকে নিজের হাতে করে কি খেতে পারবে ? ভাত যে কেমন করে রাঁধতে হয় তাই জানো না—"

বাধা দিয়া ইলা বলিল, "করতে পারি কিনা তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না মোক্ষদা মাসী, মোট কথা তুমি বল যে আমায় স্বপাকে হবিষ্য করতে হবে—এই তো ? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, নিয়ম অবশ্য পালন করতেই হবে, মা না বললেই তা শুনব কেন ?"

অগত্যা মোক্ষদাকে সব বলিয়া দিতে হইল। ইলা খুসি হইয়া বলিল, "আমি আজ হতে হবিষ্য করব মোক্ষদা মাসী, মা যে এতে মত দেবেন না সে জানা কথা। তুমি এক কাজ করো মোক্ষদা মাসী, শুধু বলে দিলে তো চলবে না, তোমায় সব দেখিয়েও দিতে হবে।"

মোক্ষদা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ওই কাজটার বেলায় মাপ করো মা, চুপি চুপি তোমায় বলে দিতে পারি, এতে মা কিছু জানতে পারবেন না, দেখাতে গেলেই মা জানতে পারবেন তখন আমার চাকরীটি যাবে। গরীব মানুষ, কাজটা গেলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।"

ইলা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ মোক্ষদা মাসী, মা যদিও কিছু বলেন আমাকেই বলবেন, তোমায় বলবেন কেন? তুমি আমায় জোর করে ভয় দেখিয়ে তো কিছু করাচ্ছ না, আমিই তোমায় জোর করে ধরেছি, তাঁর কিছু বলবার কথা থাকে তো আমায় বলবেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি মাকে রাজি করছি।"

সে যে হবিষ্য করিবে কথাটা শোভনাকে বলিবা মাত্র তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে বলিলেন, তুই আর যা তা বলিসনে ইলা, শুনে আমারই লজ্জা হয়—আশ্চর্য্য যে বলতে তোর একটুও লজ্জা হল না। হবিষ্য আবার কি বল দেখি? যদিও আমি ও সব মানি বটে—তা বলে তোকে করতে দিতে পারিনে, কেননা তাদের সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি? বিয়ে দিয়েছি—ঘরজামাই রেখেছি, একটা দিনের জন্যে শ্বশুর বাড়ী যাসনি, তাদের একটা ভাত দাঁতে কাটিস নি তবে তাদের ওষুধই বা নিবি কেন? যদি তাদের পরিবারভুক্তা

হতিস তবে করতে হতো বটে, যখন তা হসনি তখন কিছুই করবার দরকার নেই।"

ইলা যাহা বলিতে গেল তাহা বলিতে পারিল না, মলিন মুখে সে ফিরিল কিন্তু সঙ্কল্প ছাড়িল না। দাসীকে দিয়া পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইল, এখনি বিশেষ দরকারে তাঁহার ভিতরে আসা চাই।

মেয়েটীর অদ্ভুত প্রকৃতি পিতা বেশ চিনিতেন কারণ মায়ের চেয়ে সে পিতার বেশী অনুরক্ত ছিল। মাকে সে যাহা না বলিতে পারিত পিতার কাছে অসঙ্কোচে তাহা বলিত; মায়ের কাছে সে আবদার করিতে পারিত না, পিতার কাছে করিত।

উমাপতি বাবু ভিতরে প্রবেশ করিতেই ইলা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল,—"আমার হবিষ্যের জোগাড় করে দাও বাবা, মা বলছেন করতে হবে না, তাই কি হতে পারে বলতো? কেন হতে পারে না বাবা, সবাই যখন করে আমি কেন করতে পারব না?"

কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে পিতা বলিলেন, "করা তো উচিতই মা, তুমি করতে পারবে কিনা সেইজন্যে—"

বাধা দিয়া ইলা বলিল, "কেন করতে পারব না বাবা, দু পাতা পড়তে শিখেছি বলে করতে পারব না? মেয়েরা সব কষ্টই সহ্য করতে পারে, কষ্ট সহ্য করতে তারা ভয় পায় না। সকলে যা পারে আমিও তা পারব বাবা, তুমি আমায় সব ঠিক করে দাও।"

উমাপতি বাবু চিন্তিত সুরে বলিলেন, "কিন্তু তোমার মা হয় তো ঝগড়া বাধাবেন ইলা, তিনি এমনিই মনে করেন, আমরা সকলেই তাঁর বিপক্ষে, তোমায় আমি তাঁর কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়েছি বলেই তাঁর

বিশ্বাস ; আজ তাঁর অসম্মতিতে এই কাজটা করতে গেলে তিনি কি কাণ্ড করবেন সেটা ভেবে দেখ।”

ইলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “তুমি কি মার ঝগড়ার ভয়ে পেছিয়ে যাবে বাবা? তা হলে আজই আমায় মাসীমার বাড়ী পাঠিয়ে দাও, মাসীমা আর কল্যাণী আমায় ঠিক নিয়ম পালন করাবে।”

উমাপতি বাবু আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

শোভনা অনেক তিরস্কার করিলেন, অনেক কথা বলিলেন ইলা নির্ব্বিকার চিত্তে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

---

(৬৯)

ইলার পত্র খানা যতীনের হাতে পড়িল, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চারিদিক সে অন্ধাকার দেখিয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

কল্যাণী খানিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনাব এখনই সেখানে চলে যাওয়া উচিত যতীনবাবু। এতদিন অসুখ শুনেই যাওয়া উচিত ছিল, কেন যে যাননি সেই আশ্চর্য্যের কথা। সে বিষয়ে আপনাকে বেশী বলা এখন নিষ্প্রয়োজন কারণ সে আবশ্যকের সময় অতীত হয়ে গেছে। এখনও আপনার যাওয়ার বিশেষ দরকার, আপনার বউদি একা সেখানে আছেন, কি করবেন তা ভেবে ঠিক পাবেন না।"

যতীন সজল চোখ দুইটী তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল," "আমি এখন গিয়েই বা কি করব বলুন? মার সঙ্গে দেখা হবে না— আমি—"

কল্যাণী রাগ করিয়া বলিল, "আপনার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কোন পদার্থ নেই বলেই আপনি গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। আমার কথা শুনে রাগ করবেন না যতীনবাবু, অসহ্যগুলে। আমার

মোটেই বরদাস্ত হয় না বলেই আমি কথা বলি। ঘরজামাইয়ের স্বাধীনতা পর্য্যাপ্ত থাকে না, তা বলে আপনার মত করে কেউ যে থাকতে পেরেছে তাও আমরা কেউ এ পর্য্যন্ত শুনিনি। আমি জিজ্ঞাসা করছি—যদিও আমার এ কথা জিজ্ঞাসা করা অশোভনকর, তবুও জিজ্ঞাসা করছি মাপ করবেন,—আপনার মা কি টাকা নিয়ে আনাকে জীবনসর্ত্তে দান করেছিলেন?"

যতীনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এ কথা আপনি বলতে পারেন কল্যাণী দেবী, আপনি শুনেছেন মণীন্দ্রবাবু আমায় মুক্তি দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমি আমার জড়তা ঘুচাতে পারি নি। আমার মনে হয় কল্যাণী দেবী, ঘরজামাইদের অবস্থা আমারই মত হয়ে থাকে, এদের চেতনা কিছুতেই ফেরে না।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "স্বীকার করছেন—এখনও আপনার চেতনা ফেরে নি?"

যতীন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এখন আমি স্বীকার করব না। এখানকার এই মুক্ত বাতাসে আমার মনের জড়তা দূর হয়ে গেছে, আমি নিজেকে মুক্ত মনে করে আনন্দ পাচ্ছি। কল্যাণী দেবী, আমার মায়ের মৃত্যুতে আমি যতটা কষ্ট পাচ্ছি ততটা আনন্দও পাচ্ছি, কেননা এখন আমি আর ওদের আদেশে চলতে বাধ্য নই। আমার মা যতদিন ছিলেন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে—সময় সময় সকল বাঁধন কাটার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি পারিনি। আজ আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমার জন্যে আমার মাকে সত্যভঙ্গের পাপে অপরাধিনী হতে হবে না।"

তাহার চোখে একটা দীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, কল্যাণী সেই মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "তবে আজই রওনা হোন। নিজের ওপর নির্ভর করুন। ওদের অর্থে যেমন লেখাপড়া শিখেছেন, তেমনি চাকরের অধম হয়ে ছিলেন, তাদের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, আপনার সেটুকুও ছিল না, সেই স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থের বিনিময় হয়ে গেছে, তার জন্যে ভবিষ্যতে তারা আপনাকে অপরাধী করতে পারবে না।"

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জ্জিলিংয়ে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন, তিনি কল্যাণীদের বাড়ীর পাশেই বাসা লইয়াছিলেন। ইচ্ছাপ্রবৃত্তি না থাকিলেও যতীনকে তাঁহার সহিত ভদ্রতার খাতিরে কথা কহিতে হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ ধনীর জামাতা ভাইকে ভাই বলিয়া পরিচয় দিতে এখন লজ্জাবোধ করেন নাই, বরং ধরিয়া বাঁধিয়া জোর করিয়া সঙ্গে লইয়া সকল স্থানে বেড়াইতেও যাইতেন।

নারায়ণী মারা গিয়াছেন এবং যতীন দেশে যাইতেছে, কথাটা শুনিয়াই তিনি ছুটিয়া আসিলেন, "তুমি নাকি আজই দেশে যাচ্ছো যতীন?"

কল্যাণী যতীনের হইয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ওঁর মা মারা গেছেন, তাঁর শ্রাদ্ধাদি কাজ এখন ওঁকেই করতে হবে তো, কাজেই যাওয়া চাই।"

গদগদকণ্ঠে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে তো ঠিক কথাই, মায়ের কাজ সন্তানের করতেই হবে। রবীনটা কোন কাজেই লাগল না, দেশেও ফিরলে না। সেদিনে খবর পেলুম এক বার্ম্মিজকে বিয়ে করেছিল, সে পালিয়ে গেছে অনেক টাকা কড়ি হাতিয়ে নিয়ে। ওদের ওই রকমই

হয়, ওরা তো এদেশের মেয়ে নয় যে বিয়ে হলেই বদ্ধ হয়ে গেল! যে কয়টা দিন ওদের ইচ্ছা—রইল, তারপর ওই রকম করেই পালায়। আমার মনে নিচ্ছে এইবার তাকে দেশে ফিরতেই হবে নইলে—, যাক গিয়ে ওসব কথা, তবে তুমি আজই যাচ্ছো তো? আমিও এখনি প্রস্তুত হয়ে আসছি, একটু অপেক্ষা করো।"

বিস্ময়ে যতীন বলিল, "আপনি আসছেন, যাবেন কি?"

কল্যাণীও বিস্ময়ে বড় বড় চোখ দুইটী মেলিয়া চাহিয়া ছিল। একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চল, একবার ঘুরে আসা যাক। তুমি তো দু চার দিনের বেশী সেখানে থাকছ না, তোমার সঙ্গেই ফিরে কলকাতায় আসা যাবে। এদের সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি, কাল পরশু লাগাৎ আমার বড় ছেলে এদের সব নিয়ে কলকাতায় যাবে। অনেক কাল দেশে যাইনি, প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল আর কি। অনেক দিন হতে একবার জন্মভূমিটা দেখতে যাব মনে করছি, নানা বিপত্তিতে যাওয়াই হয় না, এবার যখন সুযোগ পেয়েছি—আর কি ছাড়ি।"

বলাই বাহুল্য এই আত্মম্ভরী মুখসর্ব্বস্ব লোকটীকে যতীন মোটেই পছন্দ করিত না। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ যতীনের সমবয়স্ক ছিল, সে সকলের কাছে যতীনের অজ্ঞাতে বলিয়া বেড়াইত—তাহার পিতাই খরচ পত্র দিয়া তাহাদের দুই ভাইকে মানুষ করিয়া দিয়াছেন। কল্যাণীর কানেও একদিন সে কথাটা আসিয়াছিল, সে তাই হাসিমুখে যতীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আপনার বড়দা নাকি আপনাদের জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন যতীনবাবু?"

যতীন উত্তর দিয়াছিল—"তা যদি হতো তা হলে আজ আপনার ভগ্নিপতিরূপে আমায় পেতেন না কল্যাণী দেবী, আমার জীবনের ধারা এতদিন অন্য পথে ঘুরে যেত, আমি অপদার্থ না হয়ে থেকে এতদিন যথার্থ মানুষরূপে পরিচিত হতে পারতুম।"

তাহার মুখের উপর অন্তরের গোপন বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া কল্যাণী আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়াছিল।

রওনা হইবার পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথ আসিয়া জুটিলেন, যতীন মনের বিরক্তি মনেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহাকে সঙ্গী করিয়া লইল।

অনেক কাল পরে সে আজ দেশে ফিরিতেছে। যেদিন সে আসিয়াছিল সে দিনকার কথাটা মনে করিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। যাইবার পূর্ব্বক্ষণে মা তাহার হাতে গ্রাম্যদেবীর নির্ম্মাল্য দিয়াছিলেন, তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় একটা চুম্বন দিতে ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া তাহার মাথায় পড়িয়াছিল। সে দুই হাতে মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ খানা গুঁজিয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, "তুমি কাঁদছ কেন মা, আমি তো পূজোর সময়ে আবার আসব।"

হায়রে, তখন তো সে জানিত না, সে আর মায়ের জীবদ্দশায় ফিরিতে পারিবে না। কেন সে মায়ের চেয়ে মায়ের কথাকে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছিল, সেই জন্যই তো সে এই দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে মাকে দেখিতে পাইল না।

"মা—মাগো—"

কথাটা দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপে পরিণত হইয়া গেল। ট্রেণে গবাক্ষ পথে বাহির পানে চাহিয়া চাহিয়া কতবার যে চোখ দুইটী তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কতবার সে মুখ মুছিবার অছিলায় রুমালে চোখ মুছিল তাহা পার্শ্বোপবিষ্ট বীরেন্দ্রনাথও জানিতে পারিলেন না।

ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সব যেমন তেমনিই রহিয়াছে, পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুধু তাহার।

বীরেন্দ্রনাথ তাহাকে তাড়া দিলেন, "চল যতীন, এখানে থমকে দাঁড়ালে যে? তুমি না এগিয়ে গেলে আমি যাই কি করে, আমার কি এখানকার পথ কিছু মনে আছে?"

"হ্যাঁ চলুন," বলিয়া যতীন পথে নামিয়া পড়িল।

গ্রাম্য পথ—যদিও এককালে ইহা পাকা ছিল, এখন মেরামতের অভাবে ও গো-যান যাওয়া আসার ফলে অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। পথের ধারে বন জঙ্গল খানা ডোবা। বীরেন্দ্রনাথ মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কি কদর্য্য গ্রাম। ছোট বেলায় কি দেখেছি তা মনে নেই, এখন দেখলে মনে হয় না একদণ্ড এখানে থাকি। বাপরে, এই জঙ্গল সাপ বাঘও বোধ হয় আছে, মশা মাছির কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সেবার কাগজে পড়েছিলুম এদিককার গঙ্গা নাকি বুজে এসেছে, স্রোত বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় ভাল চলে না। আগে মনের ঝোঁকে ভাবি নি, এখন ভাবছি সেই অপরিষ্কার জল খাব কি করে?"

একটা কথা যতীনের মুখে আসিতেছিল অতি কষ্টে সে তাহা সামলাইয়া শুধু হাসিয়া বলিল, "যে কয়দিন থাকবেন বাধ্য হয়ে তাই খেতেই হবে; এখানে তো কলের জল নেই যে তাই খাবেন।"

নিতান্ত অসহায়ের মত মুখখানা করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ফুটিয়ে নিলে নাকি বিশেষ দোষ হয় না।"

"তবে তাই না হয় আপনাকে করে দেওয়া যাবে।" বলিয়া যতীন হন হন করিয়া ছুটিল।

বয়সের আধিক্যে বীরেন্দ্রনাথ একটু স্থূল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তরুণ যুবক যতীনের সঙ্গে তিনি হাঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না; শ্রান্তভাবে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "একটু আস্তে চল হে, অত ছুটে চললে আমি যে নাগাল ধরতে পারি নে।"

যতীন গতি শ্লথ করিল, বীরেন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গ ধরিলেন, একটু দম লইয়া তিনি বলিলেন, "তুমিও তো গরম জল খাবে যতীন? ঠাণ্ডা জল খেয়ো না, আর ঠাণ্ডা জলে স্নানটাও বাদ দিয়ো—বুঝেছ?"

"দেখা যাবে—" যতীন উদাসভাবে উত্তর দিল।

বীরেন্দ্রনাথ একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না, দেখা যাবে কথাটা বলাই শুধু নয়, কাজেও ঠিক করে যেয়ো, কেননা এখন এখানকার জলটা তোমার আদতেই সহ্য হবে না। দুদিনের জন্যে এসে কি ছয় মাস ভুগবে?"

অসহিষ্ণুভাবে যতীন বলিল, "তাই হবে বড়দা, অন্ততঃপক্ষে আপনার স্নানের আর খাওয়ার জলের বন্দোবস্ত ঠিকই করে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

অদূরে বাড়ী, যতীন শ্রান্তনেত্রে একবার তাকাইল। এতদূর ছুটিয়া আসিয়া সে যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পা দুখানা দেহখানাকে আর টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

সে আর কিছুতেই দমন করিতে পারিল না, তাহার অজ্ঞাতে বুক ফাটিয়া একটা শব্দ বাহির হইল- -"মা—"

তাহার ভাগ্যক্রমে সে সময়টা বীরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন তাই শব্দটা তাঁহার কানে আসিল না। তিনি বলিলেন, "এই বাড়ী না যতীন, আমার ঠিক মনে পড়ছে না,—অনেক কালের কথা কিনা, মনে না থাকবারই কথা।"

ক্ষীণকণ্ঠে যতীন বলিল, "হ্যাঁ, এই বাড়ীই বড়দা।"

ততক্ষণে অনেক গুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাহাদের ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের কয়েকজনকে যতীন ছোট দেখিয়া গিয়াছিল, আজ তাহারা বড় হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতূকে এই দুইটী অপরিচিত ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া রহিল, নিকটে ঘেঁসিতে কাহারও সাহস হইল না।

পাড়ার বৃদ্ধা দিদিমা দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—যতীন না—? হ্যাঁ, সেই তো বটে, এখন সে বড় হইয়াছে, যখন এখান হইতে গিয়াছিল তখন তাহার মুখে গুম্ফ ছিল না, এখন তাহার মুখ কতকটা বদলাইয়া গেলেও দিদিমা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলেন।

আর একটি ভদ্রলোক যে যতীনের সঙ্গে রহিয়াছেন সে কথা আনন্দের আতিশয্যে তিনি প্রায় ভুলিয়াই গেলেন, সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "যতীন যে, এতকাল পরে দেশে ফিরে এসেছিস দাদা—?"

মলিন হাসির রেখা যতীনের মুখে নিমেষের তরে ফুটিয়া উঠিয়া তখনই

মিলাইয়া গেল,—"হ্যাঁ দিদি মা, সাত বছর পরে ফিরেছি। দাঁড়াও দিদি মা, এখান হতেই প্রণাম করি।"

সে নত হইতেই দিদিমা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "থাক থাক, পথের মধ্যে প্রণাম করতে হবে না দাদা, ঘরের ছেলে ঘরে চল তারপরে প্রণাম করিস।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যতীনের সঙ্গে আর একটি অপরিচিত ভদ্রলোক রহিয়াছেন। গুণ্ঠন সরিয়া পড়িয়াছিল, ব্যস্তভাবে টানিয়া দিয়া ফিস ফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটী কে রে যতীন, তোর শ্বশুর বাড়ীর কেউ কি?"

যতীন চাপাস্বরে বলিল, "এঁকে চিনতে পারছ না দিদি মা,—ইনি যে আমার বড় দাদা—সেই বীরেন—"

"ওরে চিনেছি—চিনেছি, আর তোকে বলতে হবে না।" দিদিমা অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "তাই তো বলি, আমিও তাই ভাবছিলুম। সেই ছোট্ট বেলায় দেখেছিলুম, চেহারা ঢের বদলে গেছে তাই হঠাৎ দেখে চিনতে পারিনি। সে তো দু একদিনের কথা নয়—যে দিন বীরেন চলে গিয়েছিল, তিরিশ বছরের বেশী হবে বই কম নয়। তা বেশ করেছ দাদা, অনেককাল পরে এসেছ, দেশটা দেখে যাও। আহা নারাণী কি আর আছে যে যত্ন করবে? বাছা কত বলতো—কত দুঃখ করত। কপাল—নইলে এমন সোণার চাঁদ সব ছেলে থাকতে—"

বলিতে বলিতে তিনি চোখে অঞ্চল চাপা দিলেন।

যতীন তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল, দন্তে অধর চাপিয়া সে অবাধ

কান্নাটাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার কান্না অন্তরেই চাপা থাক, এ যেন প্রকাশ হইতে না পারে।

দিদিমা চোখ মুছিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আর এখানে তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন দাদা, বাড়ীতে চল। এতখানি পথ এসেছ, শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নাত বউ বাড়ীতে আছে, সে থাকতে কিছু ভাবনা নেই। অমন লক্ষ্মী বউ কি আর একটীও হয় রে যতীন, তোদের কপাল গুণে তোরা অমন লক্ষ্মীকে ঘরে পেলি কিন্তু তার উপযুক্ত আদর করতে পারলি নে। খেটে খেটে বাছার হাড় মাস কালি হয়ে গেছে, তবু মুখে একটী কথা নেই। রবীন বুঝলে না কি লক্ষ্মীকে সে পায়ে ঠেলে গেছে, কিন্তু ভগবানের বিচারে তাকে একদিন বুঝতেই হবে রে, সে দিন এই দিন পাওয়ার জন্যে তাকে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে। ছেলেরা থেকে যে কাজ করতে পারলে না সে বউ হয়ে সে কাজ করলে, এখনও এই ভিটে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। নে, তুই ওখানে বসছিস যে যতীন, চল চল, ঘরে চল।"

বাস্তবিকই যতীন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না,—একটু বসিতে পারিলে সে যেন তখনকার মত বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সে বসিতে পারিল না, তাহাকে দিদিমার পিছনে চলিতে হইল।

ভিতরের বারাণ্ডায় সাবিত্রী বসিয়াছিল, মেধা শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ দেখাইতেছিল। সাবিত্রীর আকৃতি বড় মলিন, আর দুইটা দিন গেলে তাহার একমাস হবিষ্য শেষ হইয়া যাইবে। রুক্ষ চুলের রাশী সে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিল না, এই চুলগুলা লইয়াই তাহার বড় মুস্কিল বাধিয়াছিল, এখনও সেই অবাধ্য চুলগুলাকে কসিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সে

বকিতেছিল। মেধা তাহার অন্যমনস্ক মনটাকে ঘুরাইয়া আনিবার জন্য বলিতেছিল—"আগে এ গুলো শুনে নাও বউদি, বাবাকে দিয়ে তোমাদের পুরুতঠাকুরের কাছ হতে ফর্দ্দ করে এনেছি। এর পর বলবে যে এ হল না—তা হল না, সে কিন্তু হবে না।"

সাবিত্রী বিষণ্ণস্বরে বলিল, "আমি আর কি বলব ভাই, আমার নিজের তো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই, কেননা একটী পয়সা নেই। বাবা আজ একশো টাকা পাঠিয়েছিলেন আমি ফেরত দিয়েছি।"

মেধা বলিল, "সে কথা আমি শুনেছি, বেশ করেছ বউদি, টাকা ফেরত দিয়ে ভালই করেছ। মাসীমা জীবনে কখনও তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে পারেন নি, এ দুঃখ তাঁর মনে বরাবর ছিল, তাঁর শ্রাদ্ধের সময় কারও আত্মীয়তা অসহ্য। আমার মতে ছোড়দাকে পত্র না দিলেও ভাল হতো। জানি অবশ্য তিনি আসবেন না, মায়ের জীবন কালে এত পত্র লেখা সত্ত্বেও যিনি একবার একটি দিনের জন্যে চোখের দেখা দিতে বা দেখতে আসেন নি, মরণে শ্রাদ্ধের সময় তিনি যে কত আসবেন সে জানা কথা। পত্রটা না দিলেই ভাল হতো বউদি, এ সম্বন্ধে আর কিন্তু—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি উঠানে দরজার উপর গিয়া পড়িল। দিদিমা সানন্দে অগ্রসর হইতেছেন,—"ওলো নাত বউ, কপাল ফিরেছে যে, যতীন এসেছে, বীরেন এসেছে। মেধা, মাদুরটা এনে বারাণ্ডায় পেতে দে, ওদের বসা।"

দরজার উপর দাঁড়াইয়া যতীন, সে মুখ তুলিতে পারিতেছিল না, বিশ্বের লজ্জা সমস্ত আসিয়া যেন তাহার মাথায় চাপিয়াছে। সাবিত্রী

একবার চকিতদৃষ্টি তাহার নত মুখের উপর ফেলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল। উদ্গত অশ্রু সে আর কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিল না; যেখানে নারায়ণী শেষ শুইয়া গিয়াছেন, সেই মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া আর্ত্তকণ্ঠে সে ডাকিল—"মাগো মা, আজ কোথায় রইলে তুমি, তোমার যতীন যে বাড়ী এসেছে মা, আজ তুমি কোথায়, একবার মুহূর্ত্তের জন্যেও ফিরে এসো গো।"

মেধা খানিক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় প্রায় বসিয়া রহিল, তাহার পর সে দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দুইখানা আসন পাতিয়া দিল, শান্ত-কণ্ঠে ডাকিল, এসো যতীন দা, বসো—।"

যতীন নড়িতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

মেধা বুঝিতেছিল যতীনের মনে অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে, হতভাগ্য পুত্র সে—অনুতাপে হৃদয় তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল।

মেধা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "যতীন দা—"

যতীন মুখ তুলিল, সম্মুখে বিধবাবেশধারিণী মেধাকে দেখিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

তাহার হাত ধরিয়া মেধা ডাকিল, "এসো যতীন দা, খানিকটা বিশ্রাম করে নাও, তোমার এখনও ঢের কাজ আছে।"

"আর কি কাজ করব মেধা, আমার কাজ আর কি আছে? যা করবার কথা তা তো করতে পারলুম না—"

বলিতে বলিতে যতীন উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই নীরব হইয়া গেল।

সান্ত্বনার সুরে মেধা বলিল, "এখনও কাজ আছে বই কি যতীন দা, দুদিন বাদে মাসীমার শ্রাদ্ধ যে তোমাকেই করতে হবে। এসো বড়দাকে বসিয়ে বউদির সঙ্গে দেখা কর, বউদি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।"

শান্ত হইয়া যতীন বীরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বসাইল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল সাবিত্রী দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, রুদ্ধ রোদনাবেগে তাহার সমস্ত দেহটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আর্দ্রকণ্ঠে যতীন্ ডাকিল,—"বউদি—"

সাবিত্রী উত্তর দিতে পারিল না।

"বউদি, উঠে বসো, আমায় মাপ কর। বড় মহাপাপী আমি, সাত বছরের মধ্যে ফিরতে পেলুম না, মাকে একবার শেষ্ দেখা দেখতে পারলুম না, আমার বুকটা যে এই কষ্টেই ভেঙ্গে পড়ছে বউদি—,"

অসহ্য শোকাবেগে সে সাবিত্রীর পায়ের উপর মুখখানা রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

সাবিত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, সেই ছোট বেলাকার মতই যতীনের মাথাটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া নির্ব্বাকে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, আর তাহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া তাহার মাথায় পড়িতে লাগিল।

জমিদারের জামাতার আগমনে দেশের পেটুকের দল আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই ভাবিয়াছিল যতীন যখন আসিয়াছে তখন অবশ্যই মায়ের শ্রাদ্ধে প্রচুর ব্যয় করিয়া দেশসুদ্ধ লোককে খাওয়াইবে।

সকলেই আসিয়াছিলেন এবং যতীন ও বীরেন্দ্রনাথকে অনেক পরামর্শ দিলেন, যতীন নীরবে সব শুনিয়া গেল, বীরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

আসার সময় যতীনকে রিক্তহস্ত জানিয়া কল্যাণী জোর করিয়া তাহার হাতে একশত টাকার একখানি নোট গুঁজিয়া দিয়াছিল। যতীন কিছুতেই তাহা লইতে চায় নাই, কল্যাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, "মনে করুন যতীন বাবু, আমি আপনার বোন, আপনার টাকার দরকার পড়বে বলেই দিচ্ছি, না নিলে আপনাকে একটী পয়সার জন্যে বড় কষ্ট পেতে হবে। এমনি যদি তাতেও না নিতে চান—ধার বলে নিন, এর পরে যখন আপনার দিন ফিরবে আপনি আমার টাকা শোধ দিয়ে দেবেন।"

যতীন এই টাকার মধ্যেই মায়ের শ্রাদ্ধ সারিয়া লইতে মনস্থ করিল। সে গ্রামসুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করিল না, সামান্য দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ মাত্র খাওয়াইয়া দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিল। গ্রামের লোক গোপনে ধিক্কার দিল, সহস্রমুখে যতীনের নিন্দা ঘোষিত হইতে লাগিল।

নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই সে শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছিল, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন উমাপতির প্রেরিত তিনশত টাকা ও একখানি পত্র আসিয়া পৌছিল। টাকা লইবার আগেই যতীন পত্রখানি পড়িল, ইহাতে উমাপতি বাবু অনুযোগ করিয়াছেন তাঁহাকে না জানাইয়া দার্জ্জিলিং হইতেই চলিয়া যাওয়া যতীনের উচিত হয় নাই, তাঁহার কাছে একবার বলিলে তিনি কি আপত্তি করিতেন? যাহাই হোক, টাকা তিনি পাঠাইতেছেন, গ্রামে ম্যানেজার বাবুও আছেন, যদি আর টাকার দরকার পড়ে তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যতীন যেন ভাল করিয়াই মাতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করে এবং তাহার পর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। তাহার একজামিন নিটববর্ত্তী হইয়াছে এ সময় ভাল কয়িয়া পড়া আবশ্যক, নহিলে সে পাস করিবে কি করিয়া?

যতীন একটু হাসিল মাত্র। টাকা সে লইল না, ফেরৎ পাঠাইয়া দিল।

বিস্ময়ে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "টাকা নিলে না কেন যতীন? ছিঃ, কাজটা তোমার উপযুক্ত হল না।

শান্তকণ্ঠে যতীন বলিল, "নিলুম না, কেননা দেনা পাওনার সম্পর্ক আমার চুকে গেছে। এখন দেনা করে আর আমার সুধবার জন্য পাগল হয়ে বেড়াবার ইচ্ছে নেই বলেই টাকা ফেরৎ দিলুম।

সাবিত্রী টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা শুনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কাজটা ভাল করলে না ঠাকুর পো—।"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া যতীন বলিল, "কিসে মন্দ করেছি বউদি?

ঘরজামাইয়ের জীবন যে কি রকম ঘৃণ্য তা যদি জানতে তবে মুক্তি পেয়েও আবার অধীনতাপাশে আমায় তোমরা বন্দী হওয়ার অনুরোধ করতে পারতে না। মায়ের মরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেখানকার বাঁধন খসে গেছে, আমি মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারছি—যেমন তাদের নিয়েছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছি, নিজের স্বাধীনতা এতদিন তাদের দিয়ে রেখেছিলুম, এর বেশী আর কি থাকতে পারে বউদি? ঘৃণ্য কুকুরের জীবন এতদিন বহন করে এসেছি, তারা উঠতে বলেছে—উঠেছি, বসতে বলেছে—বসেছি, আবার কি আমায় সেখানে—সেই ঘৃণ্যভাবে জীবন যাপন করতে যেতে বল বউদি? তাদের সঙ্গে যে কারবার ফেঁদেছিলুম তা শেষ করে এসেছি, এখন আবার টাকা নিলেই আমায় যে বন্দীত্ব স্বীকার করতে হবে বউদি, সেটা ভেবেছ কি?"

সাবিত্রীর হইয়া মেধা উত্তর দিল,—"ভেবেছি বই কি যতীন দা, আমরা সবাই সে কথা ভেবেছি। বড় হাসি পাচ্ছে শুনে—তুমি যে বলছ সকল বাঁধন কেটে এসেছ তা পেরেছ কি, তোমার কি সেখানে কোন বাঁধন নেই; মুক্তি—স্বধীনতা এ সব কথা আর মানায় না যতীন দা,—না বউদি?"

যতীন একটু হাসিল, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিল, "কেন বল দেখি?"

মেধা দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "বউদিকে তো ফেলতে পারবে না যতীন দা, সে তোমায় টানবেই দেখে নিয়ো।"

যতীন স্থিরদৃষ্টি মেধার মুখের উপর ফেলিয়া বলিল, "এ কথা তুমি কেন—সবাই বলবে মেধা, কিন্তু যদি জানতে—স্ত্রী আর স্বামীতে

পার্থক্য কতদূর আছে তা হলে আর এ কথা বলতে পারতে না। তুমি হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে আছ যে বউদি, কথাটা বুঝতে পেরেও পারছ না? আমাদের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান রয়েছে, আমার বিশ্বাস এ দূরত্ব আমাদের কখনই ঘুচবে না। তাই তো বলছিলুম বউদি—তাদের যা নিয়েছি তার চেয়ে বেশী আমি দিয়ে এসেছি, কাথাটা অযথার্থ নয়।"

সাবিত্রী একটু হাসিয়া বলিল, "এমনও তো হতে পারে ঠাকুর পো—দূরত্ব এইবারে কাটবে।"

শুষ্কমুখে মাথা নাড়িয়া যতীন বলিল, "অসম্ভব, দরিদ্র ধনীকে ভালবাসতে পারে কিন্তু ধনী দরিদ্রকে ভালবাসতে পারে না। তোমাকে নিজের বোনের মতই জানি বউদি, তাই অসঙ্কোচে মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত করেও যাই। আজ বলছি বউদি—যদি ধনীর সঙ্গে মা আমার বিয়ে না দিতেন, আমি যথার্থ সুখী হতে পারতুম।"

কথাটা এই খানেই থামিয়া গেল, মুখরা মেধা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল, যতীনও শ্রাদ্ধের উদ্যোগে ব্যস্ত হইল সাবিত্রীও এ কথাটা বেশীক্ষণ মনে জাগাইয়া রাখিতে পারিল না, কাজের মধ্যে পড়িয়া শীঘ্রই ভুলিয়া গেল।"

শ্রাদ্ধের ব্যাপার মিটিয়া গেলে, বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনভ্যস্ত পল্লী বাসে তিনি আর স্বস্থ ছিলেন না, সকল বিষয়ে তাঁহার এখানে অসুবিধা বোধ হইতেছিল।

যতীনকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আর কতদিন এখানে থাকবে হে যতীন, আজ এক হপ্তা হল এসেছ, এখন যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

যতীন নিশ্চিন্তভাবে বলিল, "তা আপনি যান না বড়দা।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি যাবে না ?"

যতীন গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, সেখানে যেতে আর আমার ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছে নেই—?" বীরেন্দ্রনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, খানিকক্ষণ তিনি কথাই বলিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সবর্বনাশ, সামনে তোমার একজামিন আসছে, পড়া কামাই দিয়ে এখানে—এই পাড়াগাঁয়ে—নোংড়ামীর মধ্যে তুমি থাকতে চাও যতীন ?"

যতীন তেমনি গম্ভীর স্বরে বলিল, "পরীক্ষা দেব না বড়দা, পাস করে কিছু চারখানা হাত আমার বেরুবে না, অনর্থক আর তাঁদের পয়সা খরচ করাতে চাইনে।"

বীরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "এখানে আমার একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে করে না আর তুমি স্বেচ্ছায় এখানে থাকতে চাও যতীন ?"

যতীন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি তো জানেন বড়দা, পনের যোল বছর আমারি এখানে এই নোংড়ামীর মধ্যেই কেটেছে, সাতটা বছর সহর বাসেও আমার পূর্ব্ব সংস্কার দূর হয়নি, গ্রাম্য স্বভাব যায় নি এই কথা সেখানে সবাই বলেন। এই জন্যেই আমি একবার গ্রামের বুকে ফিরে আর সেখানে যেতে চাইনে বড়দা, আমার সকল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে সেখানে তাদের কৃপার প্রার্থী হয়ে জীবন যাপন করতে আমি আর চাইনে। আপনার সঙ্গে আমার শ্বশুরের বন্ধুত্ব আছে

জানি, আপনি তাঁকে জানাবেন—আমি আর ফিরে যাব না, যেমন করেই হোক এখানে থেকে কিম্বা অন্যত্র থেকে নিজের চেষ্টায় জীবিকার্জ্জন করব, সে আমার মানের ভাত। পরাধীন অবস্থায় রাজার মত খাওয়া আর মোটরে উঠে হাওয়া খাওয়ার চেয়ে সামান্য শাকভাত খেয়ে দশ বার টাকা বেতনের চাকরী নিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা শ্রেয় ?”

বীরেন্দ্রনাথ এই তরুণ যুবকের অল্প বুদ্ধি দেখিয়া দুঃখিত হইলেন ; নিজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইতে লইতে বলিলেন, “কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল করলে না যতীন, এর পর তোমায় এর জন্যে পস্তাতে হবে।”

শান্তস্বরে যতীন বলিল, “আমার বিশ্বাস আছে বড়দা, আমায় আমার কাজের ফলে কখনই পস্তাতে হবে না। মুক্তি জীবমাত্রেরই ঈপ্সিত বস্তু, তাতো জানেন ? পক্ষীকে যদি খাঁচায় পুরে রাখেন, মুক্তির আশায় সেও ছটফট করে, মানুষ আমি, আমার জ্ঞান আছে—বুদ্ধি আছে, নিজের ভালমন্দ আমি বুঝতে পারি—মুক্তির পথ থাকতেও কেন বন্দী হয়ে থাকব বড়দা ?”

বীরেন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন।

প্রেরিত টাকা যখন ফেরত আসিল তখন উমাপতি বাবু খানিকটা গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর তৎক্ষণাৎ দেশের ম্যানেজার নিশি-কান্ত গাঙ্গুলীকে কলিকাতায় আসিবার জন্য পত্র দিলেন।

যেদিন নিশি গাঙ্গুলী কলিকাতায় পৌঁছাইলেন, সেই দিন বীরেন্দ্রনাথও আসিয়া পড়িলেন। জামাতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া উমাপতি বাবুর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল, তিনি মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "বটে, সে মুক্ত হয়েছে বলে অহঙ্কার করেছে? হতভাগা গরীবের ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিয়েছি কিনা—মনে ভেবেছে গাঙ্গ পার হয়ে গেছে, এখন কুমীরকে কলা দেখালে ক্ষতি নেই। নির্ব্বোধ সে, এখনও জানে নি—ভাবে নি, যে দেশকে সে দেশ বলে গর্ব্ব করছে, যে দেশে থেকে সে স্বাধীনতা সুখ উপলব্ধি করবে, সে দেশ আমার, তার বাড়ী আমারই জমীতে। সে মনে করে নি—আমি ইচ্ছা করলে এখনই তার চালা তুলে ফেলতে পারি, তার ঘরের দেয়াল উপড়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, তাকে আমি যেমন করেই পারি জব্দ করব, তাকে যেন আবার আমারই দুয়ারে এসে ভিখারীর মত দাঁড়াতে হয়, তাই আমি করব। নিশি বাবু, আমি দু এক দিনের মধ্যেই গ্রামে যাব, যে সব প্রজার জমি ভিটের খাজনা বাকি পড়ে আছে, তাদের একটা লিষ্ট তুমি তৈরী করে ফেল গিয়ে।"

নিশি গাঙ্গুলী সসম্ভ্রমে বলিলেন, আজ্ঞে, সে সব তৈরী আছে। আপনি গেল মাসে বলেছিলেন যখন তখনই তৈরি করে রেখেছি।”

উমাপতি বাবু বলিলেন, “যতীনদের কত দিনের খাজনা বাকি আছে সেটা ঠিক করে রেখেছ?”

নিশি গাঙ্গুলী আমতা আমতা করিতে লাগিলেন, ধমক দিয়া উমাপতি বাবু বলিলেন, “একটা উত্তর ঠিক করে দাও কত বছরের খাজনা বাকি আছে।”

নিশি গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “আজ্ঞে—যতীনের বাপ মিত্র মশাই থাকতে রীতিমতই খাজনা আদায় হয়েছিল তারপর চার পাঁচ বছরের খাজনা বাকি পড়বার পর মাত্র সাতটী টাকা মিত্র মহাশয়ের বিধবা একবার দিতে পেরেছিলেন, তার পরে নয় বছর মোটেই খাজনা—”

বাধা দিয়া উমাপতি বাবু বলিয়া উঠিলেন, “বস কর নিশিবাবু, ওদিককার পাঁচ বছর আর এদিককার নয় বছর এই চৌদ্দ বছর যে জমিদারের খাজনা বাকী এ খবর এতকাল কেন তুমি দাও নি?”

যে খাজনা দিবে সে যে জমিদারেরই গৃহজামাতা এবং সেই জন্যই খাজনার কথা যে উঠে নাই, উঠিলেও কথাটা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাইত একথাটা নিশি গাঙ্গুলী বলিতে পারিলেন না, তিনি কেবল মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

তাঁহার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ ফেলিয়া উমাপতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “চৌদ্দ বছরের খাজনা মায় সুদ কত হয়েছে ঠিক আছে?”

মলিন মুখে নিশি গাঙ্গুলী মাথা নাড়িলেন।

উমাপতি বাবু তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার কাজে বিলক্ষণ শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে নিশিবাবু, আশা করছি এবার হতে সাবধান হবে ভবিষ্যতের জন্যে। আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম করে নাও, কালই তোমায় ফিরে গিয়ে যার যা খাজনা বাকি আছে মায় সুদ সুদ্ধ—হিসাবটা করে ফেলো। আমি দু তিন দিনের মধ্যে গিয়ে সব দেখব আর খাজনা আদায়ের যা হয় তা ব্যবস্থা করব।"

ইলাকে তাঁহারা আর দার্জ্জিলিং যাইতে দেন নাই। কল্যাণীকে শোভনা মোটেই সুনয়নে দেখিতে পারেন নাই, আভিজাত্য গর্ব্ব যে কি কল্যাণী তাহা জানে না। এখানে যে কয়দিন ছিল—কখনও রন্ধন গৃহে গিয়া মোক্ষদার কার্য্য করিয়াছে, কখনও দাসীদের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে গিয়াছে। সংক্রামক কলেরা ব্যারাম—নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, পরিবারের শুভাশুভের দিকে না তাকাইয়া, সে জোর করিয়া সেই রোগীকে বাগানের চালায় রাখিয়া তাহার সেবার ভার লইল। ভাগ্যক্রমে চাকরটী সুস্থ হইয়া উঠিল এবং বাড়ীতে রোগের জারম যাহাতে না ছড়াইয়া পড়িতে পারে তাহার জন্য শোভনা বিশেষ সতর্কতা রাখিয়া-ছিলেন তাই—নহিলে কি সাংঘাতিক কাণ্ডই না ঘটিত। বাবাঃ, কি মেয়ে সে, মনে করিতেও শোভনার বুক কাঁপে। উহার সাহচর্য্যে থাকিয়া ইলার অমন যে প্রকৃতি, তাহাও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যতীনকে দু দিনেই সে আকর্ষণ করিয়াছে। একে তো সে ভিখারিণীর পুত্র অমনি চায়, সম্ভ্রান্ত সমাজে কিছুতেই সে মিশিতে পারে নাই, কল্যাণীকে পাইয়া সেও তাই বাঁচিয়াছিল। অধঃপাতে যাক সে, বাঁচিয়া

থাক এইমাত্র প্রার্থনা, তাই বলিয়া ইলাকে কল্যাণীর কাছে তিনি আর চাহেন নাই। ইলা এখানে থাক, সুশিক্ষা লাভ করিবে, তিনি নিজে তাহাকে আবার উপযুক্ত রূপে গড়িয়া তুলিবেন।

তিনি জানেন নাই কাঁচ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা জোড়া দেওয়া যায় না। তাঁহার অজ্ঞাতে ইলার মন কবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, যে জামাই উপযুক্ত হইতেছে না বলিয়া তিনি ঘৃণা করিতেন—সেই জামাতার দিকেই কবে ইলার মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যাহাকে দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেন, ইলার কাছে তাহাই গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

জামাতার জেদ শুনিয়া শোভনা চীৎকার করিয়া যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গেলেন। ইলা গোপনে হাত দুখানা ললাটে ঠেকাইয়া ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তাঁর এই মনুষ্যত্বটুকু জাগিয়ে রেখো প্রভু, অনাহারে কষ্ট পেলেও তিনি যেন আর ধনী শ্বশুরের দরজায় প্রত্যাশী হয়ে এসে না দাঁড়ান। আমি শ্বশুরের অর্থে ধনী স্বামীর স্ত্রী নামে পরিচয় দিয়ে গৌরব অর্জ্জন করতে চাইনে গো, স্বাধীনচেতা দরিদ্র স্বামীর স্ত্রী নামে পরিচিত হতে চাই।"

এক সময়ে ইলাকে একা পাইয়া মোক্ষদা দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিলেন, "মাগো মা, যতীনটার কি আক্কেল বাছা—আমি কেবল তাই ভাবছি। ওই যে কথায় বলে না—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, তার হয়েছে ঠিক তাই। এই তেতালা তিনমহলা বড়ীতে দশটা ঝি চাকর পেছনে ঘোরে, কোর্ম্মা কাবাব খেতে পায় এ সুখ তার কপালে সইবে কেন? গরীবের কুঁড়ে ঘর বর্ষায় চাল ফুটো করে ঝর ঝরিয়ে

জল পড়ে, সেই ঘরে থাকবে আর মোটা লাল চালের ভাত, শাক ভাজা খাবে, এই হচ্ছে ওর কপালের লেখা—ও কি এ ঠেলতে পারে ?"

উদ্বিগ্না ইলা বলিল, "কেন, তাঁদের চাল কি ভাঙ্গা ?"

মোক্ষদা বিস্ময়ের সুরে বলিল, "সে কি এক জায়গায় বাছা, হাজার জায়গায়। বউ ছুঁড়ির হাতে একটী পয়সা নেই যা দিয়ে ঘরটা ছাওয়ায়। এতদিন পেটের দায়ে জিদ ভেঙ্গে তাকে ঠিক বাপের বাড়ী গিয়েই উঠতে হতো, মেধা আছে তাই তবু যেমন করেই হোক দুমুঠো খেতে পাচ্ছে। তা—সেই বা আর কত দেবে বল ? তার বাপের দোকান নেই, বসে খেলে রাজার রাজত্বি যায়, এ তো সামান্য টাকা মাত্র।"

শ্বশুরালয় সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে ইলা কোন দিনই উৎসুক হয় নাই। পাছে কেহ তাহাকে হীন মনে করে, এই ভয়ে সে প্রাণপণে শ্বশুরালয় সম্বন্ধীয় কথা এড়াইয়া চলিত, আজ কিন্তু তাহার সে ভাব রহিল না ; সে উৎসুক হইয়া বলিল, "কেন, ওঁর ভাজের কি—"

বাধা দিয়া মোক্ষদা বলিলেন, "সে কথা আর বল কেন মা, সব কথা শুনলে বুঝতে পারবে। ওদের সবাই ওই এক ধারার, গোঁয়ার যাকে বলে তাই। ওই বড় বউটি বড়লোকের মেয়ে গো, বাপের বাড়ীতে ওরই পেছনে দুজন ঝি ঘোরে, নিজের ইচ্ছেয় সে সুখ ত্যাগ করে এসেছে। বাপ মা আসতে দেবে না গরীবের ঘরে, মেয়ে ঝগড়া করে জোর করে চলে এসেছে। তার পরে তারা কত না নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে—জানি নে কি সুখেই আছে—ভাঙ্গা ঘরে বাস করে, আধপেটা খেয়ে, কিছুতেই বাপের বাড়ী যাবে না। ওদের সবাই ওমনি গো, নইলে কি

আর বলি সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় ? ওরা সুখ চায় না, রাজার হালে থাকা পছন্দ করে না, এমনি করে লোকের কথা শুনে, খেয়ে না খেয়ে ভাঙ্গা ঘরে পড়ে থাকতে চায়।”

এইটুকু কথার মধ্য দিয়াই ইলা জান্নের যে পরিচয় পাইল তাহা অত্যন্ত বেশী, এই কথাটুকু তাহার কল্পনা চোখে সেই আত্মত্যাগিনী মেয়েটীর স্বরূপ যেন আঁকিয়া দিল।

অন্যমনস্কভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, “মেধা কে ?”

মোক্ষদা বলিল, “সেখানকার সোণার বেণেদের মেয়ে গো বাছা, ওদের হাতের জল চলে না, কিন্তু যতীনদের বাড়ী সব চলে যায়, কত দিন দেখেছি মেধা ঘড়া করে জলও বয়ে এনে দিয়েছে। বড় স্পষ্টবক্তা গো, যার তার মুখের সামনে যা তা বলে দেয়,—বাপের পয়সা আছে কিনা, তাই কাউকে তোয়াক্কা করে না। তা এদিকে যাই হোক—স্বভাব চরিত্র ভাল, বিধবা হয়ে এতকাল ওখানে আছে কেউ একটা কথা বলতে পারে নি। যতীনের মাকে সে নিজের মায়ের মত দেখ্‌ত—ওদের সব নিজের ভাই বোনের মত দেখে। যতীনের মা বলত—যদি সে সোণার বেণে না হতো তাকেই যতীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে নিত। মেয়েটী যতীনকে যেমন ভালবাসত যতীনও তেমনি তাকে ভালবাসত, তার মেধাকে বিয়ে করার ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু তাই কি হতে পারে গো মা, কাজেই মনের ইচ্ছে মনেই চাপা রইল, ও আর ফুটতে পায়নি।”

ইলা অন্যমনাভাবে হাতের বইখানার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। আর কোন কথা তাহার জিজ্ঞাসা করার মত ছিল না, যাহা জানিবার সবই যেন জানা হইয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া যাইতে গিয়া কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মোক্ষদা চুপি চুপি বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলুম মা, সাত তালে পড়ে ভুলেই গিয়েছিলুম। তুমি বোধ হয় জানো তোমাদের জমিদারী হ'তে নিশি গাঙ্গুলী এসেছে, কর্ত্তাবাবু তাকে কি জন্যে তলব করেছেন বোধ হয় তাও শুনেছ?"

ইলা বলিল, "ও সব খবরে আমার কাজ কি, বাবার কাজ পড়েছে, তিনি ডেকেছেন—আমি—"

ইলার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাতখানা ঘুরাইয়া মোক্ষদা বলিলেন, "সে কাজটা যে কি তা তুমি জানো না মা, তোমায় কেউ হয় তো জানাবেনও না। যতীন দেশে তাদের বাড়ীতে গিয়ে রয়েছে বলে কর্ত্তাবাবু ভারি রেগেছেন, তাকে বেশ করে জব্দ করবার জন্যেই কর্ত্তাবাবু নিশিবাবুকে ডেকেছেন।"

বিবর্ণ হইয়া গিয়া ইলা বলিল, "জব্দ করবেন,—মানে? এ তো বেশ কথা যে তিনি ঘরজামাই হয়ে থাকতে চান না, নিজের ঘরে স্বাধীনভাবে থাকতে চান; এর জন্যে বাবা তাঁকে জব্দ করবেনই বা কেন আর করবেনই বা কি করে?"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া মোক্ষদা ভারিচালে বলিলেন, "ওইটুকুই কথা বাছা, জগতটা যত দেখবে ততই একে চিনবে। হ্যাঁ, সে যে এমন রাজার বাড়ী ছেড়ে গেছে এর জন্যে আমরা সবাই তার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দে করছি, কিন্তু মা,—এরই জন্যে—এই অছিলে পেয়ে নিশিবাবু যে বাকি খাজনার দায়ে তার ঘরের চাল কেটে নিয়ে সব সমতল করে ফেলবেন, তার নির্দ্দোষী ভাজকে গলা ধরে বের করে দেবেন, এ আমরা

সহ্যি করতে পারি নি। বাছা, নারাণী আমার সই ছিল, সত্যি নিজের অবস্থা ভাল নয়—তোমাদের বাড়ী আজন্ম কাজ করে কোন মতে পেটটা চালাই বলে তাকে কোন দিনই সাহায্য করতে পারিনি, তবু যখনি বাড়ী গিয়েছি, তার ছেলেদের জন্যে দু পয়সার একটা খেলার জিনিসও কিনে নিয়েছি। এতদিন এ সব কথা বলতে পারিনি মা, বলবার যে কখনও দরকার হবে তাও ভাবিনি, আজ বড় ব্যথা পেয়েই তোমার কাছে মনের কথাগুলো বলে ফেলেছি। যতীনের বিয়ের সম্বন্ধ ভশ্চার্যি মশাইকে দিয়ে প্রথম আমিই করাই, ভেবেছিলুম গরীবের ছেলেটা, আদরে যত্নে থাকবে, মানুষ হয়ে যাবে। এখানে মা—ঘরজামাইয়ের যা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতা সবই দেখলুম। যদিও আদর যত্নের অভাব ছিল না কিন্তু সে রকম আদর যত্ন মানুষ পোষা কুকুরকেও করে। একদিন এই কথা নারাণীকে বলতে যাচ্ছিলুম, বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম—আমরা না হয় কথাটা পেড়েছিলুম, কিন্তু সে কি করে রাজি হল। বড় বউমা আমায় বুঝিয়ে হাতে পায়ে ধরে থামিয়ে দিলে, আমি আর কোন কথা বলতে পারিনি। মা, হাজার হোক তোমার স্বামী সে, আর কেউ না জানুক—আমি জানি—আমি বুঝি—তুমি তাকে কতখানি ভালবাস——”

অকস্মাৎ অনেকখানি চমকাইয়া শুষ্ক-মলিন মুখে ইলা বলিয়া উঠিল, —“আমি?” পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া সে সবেগে বলিল, “নাঃ, তুমি ভুল করেছ, আমি বরাবর তাঁকে ঘৃণা করি, দেখেছ?”

মোক্ষদা হাসিলেন, “মাগো, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে কি? তোমার ওই ঘৃণার পেছনে কতখানি ভালবাসা ভক্তি জমানো আছে তা এখন উপছে উঠেছে, সে কাছে নেই—দূরে গেছে জেনে তুমি যতখানি

কষ্ট পেয়েছ, ততখানি সুখীও হয়েছ। দেখ মা, আমরা অশিক্ষিতা মেয়ে, তাই আমরা বাইরের চোখ দিয়ে দেখে মানুষ চিনতে পারিনে, আমরা অন্তর দিয়ে মানুষের অন্তর চিনতে পারি। জানি—যদি তুমি যতীনের দিকে দাঁড়াতে পার, তোমার বাপ তাকে ক্ষমা করবেন, তার সাত পুরুষের ভিটে নিয়ে এ রকম ছেঁড়াছেঁড়ি করতে পারবেন না।"

তেমনি বিবর্ণ মুখে ইলা বলিল, "আমি কি করতে পারব?"

মোক্ষদা বলিলেন, "মা, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধেক, আলাদা তো নয়। তুমি ভিন্ন তোমার স্বামীকে বাঁচাতে আর কেউ পারবে না। তুমি তোমার বাপকে বলো——"

মাথা নাড়া দিয়া শুষ্ক হাসিয়া ইলা বলিল, "তুমি আমার বাবাকে চেন না দেখছি। তিনি যাকে যে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করবেন তা দেবেনই, কেউ তাঁকে ঠেকিয়ে এ পর্য্যন্ত রাখতে পারেনি। বিশেষ আমার স্বামী সম্বন্ধে কথা—আমি কোন মুখে তাঁর কাছে বলব বল দেখি?"

মোক্ষদা মুহূর্ত্তে নিভিয়া গিয়া বলিলেন, "তবে কিছু টাকা তার কাছে কোন রকমে পাঠিয়ে দাও, সে যেন খাজনা মিটিয়ে দিতে পারে।"

ইলা বলিল, "বেশ কথা বলেছ। তোমাকেই দুদিনের জন্যে সেখানে যেতে হবে, টাকাটা দিয়েই চলে এসো। কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে—এ টাকা যে আমিই দিচ্ছি, এ কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না। তুমিই যেন টাকা দিচ্ছ এই কথা সেখানে বাড়ীর সকলকে বলতে হবে, এ প্রতিজ্ঞা না করলে টাকা দেব না।"

বিস্মিতা মোক্ষদা ইলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করাইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দাসী আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "বামুনদি, এখানে গল্প করতে বসেছ এখন, ওদিকে রান্নাঘরে উনোনে তরকারী পুড়ে উঠেছে, চারিদিকে গন্ধ ছুটেছে। মাঠাকরুণ খুব বকছেন, বলছেন—"

তাড়াতাড়ি মোক্ষদা চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"তাই হবে মা, প্রতিজ্ঞাই রইল, তুমি সব ঠিক কর। আমি কালই যাব।"

ইলা বইখানা টেবলের উপর ফেলিয়া দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল।

কি নিদারুণ অত্যাচার! পিতামাতার ব্যবহারের কথা সে যতই ভাবিতে লাগিল অন্তর তাহার ততই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। বাস্তবিক সে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করার জন্যই না সে সকল স্বাধীনতা হারাইয়াছিল? এখন যদি সে স্বাধীনতা লাভ করিতে চায়, সেটা কি অনুচিত? তাহার পিতা ধনী জমিদার বলিয়াই অবাধে এ রকম অত্যাচার করিয়া যাইবেন আর তাহার স্বামী দরিদ্র বলিয়াই সব সহ্য করিবে, দরিদ্রের অপরাধ কি এতই বেশী?

ইলা বেশ বুঝিতেছিল ব্যাপারটা সহজে কখনই মিটিয়া যাইবে না, শ্বশুর জামাতার বিবাদ, শেষটায় আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে। যতীন এতকাল শুধু মায়ের জন্য—মায়ের কথা রক্ষার্থে এখানে পড়িয়া ছিল, মা তাহাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন, সে আর অধীনতাপাশে বদ্ধ হইবে কেন? পিতা তাহার উপর যে অত্যাচার করিতে যাইবেন, সেও সহজে তাহা সহ্য করিবে না, ছিঃ, ব্যাপারটা কি জঘন্য!

ইলা মনে করিল পিতাকে সে বুঝাইয়া থামাইবার চেষ্টা করিবে। মাকে এ সব কথা জানানো হইবে না, তিনি যে জামাতার বিপক্ষে থাকিবেনই সে জানা কথা। আজ সন্ধ্যায় পিতার কাছে কথাটা তুলিয়া ফলাফল যাহা হয় বুঝিয়া কাল মোক্ষদাকে দিয়া টাকা দিয়া পাঠাইবে। অনর্থক যাহাতে এই কলঙ্ককর ব্যাপারটীর অনুষ্ঠান না হয় সে জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

---

(২২)

সে দিন সন্ধ্যার পর উমাপতি বাবু বৈঠকখানায় বসিতে পারেন নাই। শরীরটা আজ তেমন ভাল ছিল না, মনটাও বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। জামাতাকে জব্দ করা চাই অথচ শাস্তি দিতে গেলে সে যে সুবোধ বালকের মতই সে শাস্তি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না ইহা বেশই জানিতেন। এই সামান্য একটা ঘটনা হইতে অনেক বড় বড় ব্যাপারের সৃষ্টি হইবে, শেষটায় মামলা মোকর্দ্দমায় জেরবার হইয়া পড়িতে হইবে। টাকার জন্য তিনি ভয় পান না, গরীব যতীন যে অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে না, ইহাও তিনি বেশ জানিতেন। তবে লোকে যে নিন্দা করিবে তিনি জামাতার সহিত মোকর্দ্দমা করিতেছেন; এই একটা ভাবনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল।

দ্বিতলের খোলা বারাণ্ডায় চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া উমাপতি বাবু ভাবিতেছিলেন ব্যাপারটা এতদূর অগ্রসর হইতে দিবেন কি না। এইখানে থামাইয়া ফেলিলে যেন তাঁহারই মস্ত বড় হার হইয়া যায়। এ জীবনে তিনি কখনও কাহারও কাছে পরাভব স্বীকার করেন নাই, আজ নগণ্য যতীনের কাছে তিনি পরাভব মানিয়া লইবেন? না, লোকে সামান্য একটু নিন্দা করিবে মাত্র, দুদিন পরে সে সবই চাপা পড়িয়া যাইবে, অবাধ্য যতীনকে শাস্তি দিয়া বাধ্য করা চাই।

সে ভাবিয়াছে সে যাহাই করুক না কেন উমাপতি বাবু কিছুই করিতে পারিবেন না, কারণ সে তাঁহার জামাতা। তাহাকে জানাইয়া দেওয়া উচিত উমাপতি বাবু স্নেহের বশ নহেন, বাধ্যবাধকতার বশ নহেন, সেই জন্যই জামাতার এই ঔদ্ধত্য তিনি কোনরূপে সহ্য করিবেন না। ইলা যে তাঁহার একমাত্র স্নেহের কন্যা, আদরের পাত্রী, ইলা যদি অবাধ্যতাচরণ করে তিনি ইলাকেই ত্যাগ করিতে পারেন।

ইলার কথাটা মনে উঠিতেই আর একটা কথা মনে পড়িল, ইলার দিকটা তিনি একবার দেখিবার চেষ্টা করিলেন। ইলার স্বামীকে তিনি শাস্তি দিবেন ইহাতে ইলার কষ্ট হইবে না তো?

না, ইলা যতীনকে ভালবাসিতে পারে নাই, ধনীর কন্যা দরিদ্রকে ভালবাসিতে পারে না। এ কথাটা আগে যদি ভাবিয়া দেখিতেন—যদি সমান ঘরে ইলার মনের ইচ্ছানুসারে তাহার বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে আজ ঘটনাচক্র অন্যদিকে ঘুরিয়া যাইত। তিনি জানিয়াছেন ইলা যতীনকে ঘৃণা করে, হাঁ ঘৃণা করিবার কথাই তো, আহা, চির-আদরিণী স্নেহের কন্যার জীবনটাকে এরূপ দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন তো তিনিই, যদি অত ছোট বয়সে তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ না দিতেন।

কিন্তু ইহাতে তো তাঁহাকেও দোষী করা যায় না। তিনি ভাবিয়াছিলেন গরীবের ঘরের একটী ছোট ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইবেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিবেন, যেন তাঁহার অন্তে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নামটা বজায় রাখিতে পারে। তিনি তো জানেন ধূর্ত্ত শৃগালের

সন্তান জন্মাবধি মেষের মধ্যে থাকিয়াও ধূর্ত্ত হইয়া উঠে, ব্যাঘ্রশিশু পোষ মানে না, তবে কেন এ ভুল করিয়াছিলেন? ছিঃ, যে ভুল তিনি করিয়াছেন সে ভুল সুধরাইবার পথ যদি থাকিত, হিন্দুর বিবাহবিধি যদি উঠিয়া যাইবার হইত!

"বাবা—অন্ধকারে একলা বসে আছেন কেন, আজ বৈঠকখানায় বসেন নি যে—?"

বলিতে বলিতে ইলা আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল।

বাগানের আলোর দীপ্তি মৃদুভাবে রেখার মত বারাণ্ডায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই আলোতে ইলার হাসিমাখা মুখখানার পানে তাকাইয়া পিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না মা, আজ শরীরটা তত ভাল নেই সেইজন্যে যাই নি।"

"শরীর ভাল নেই, অসুখ করেছে নাকি বাবা, দেখি আপনার গা—"

ব্যস্তভাবে ইলা তাড়াতাড়ি পিতার গায়ে হাত দিল। একটু হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া পিতা বলিলেন, "না রে পাগলি, অসুখ করে নি।"

উদ্বিগ্ন হইয়া ইলা বলিল, "তবে কি হয়েছে বাবা?"

উমাপতি বাবু বলিলেন, "মনটা আজ বড় খারাপ হয়ে গেছে মা, সেইজন্যে শরীরেও মোটে যুত পাচ্ছি নে।"

কেন যে পিতার মনটা আজ ভাল নাই তাহা ইলা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল, সে তাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

"আমার মাথায় একটু হাতখানা বুলিয়ে দেতো ইলা, মাথার ভিতরটা কি রকম করছে।"

ইলা পিতার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইলাকে কথাটা বলিবার জন্য উমাপতি বাবুর ইচ্ছা হইতেছিল, হঠাৎ সে কথাটা বলিতেও পারিতেছিলেন না।"

"বাবা, আজ একটা কথা শুনলুম, সে কথা কি সত্যি?"

ইলার প্রশ্নে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া উমাপতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা মা?"

কথাটা বলিতে ইলার মুখে বাধিয়া যাইতেছিল, তথাপি জোর করিয়া সে বলিতে গেল,—"এই শুনছি যে—গ্রামে নাকি বাকি খাজনার দায়ে—"

কথাটা শেষ করিতে সে পারিল না।

নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া উমাপতি বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই কথাটা আমিও তোকে বলব ভাবছিলুম মা। সত্যিই চৌদ্দ বছরের বাকি খাজনার দায়ে যতীনদের বাড়ী ঘর সব জমিদারের খাসে আসবে।"

ইলা বলিল "চৌদ্দ বছর খাজনা তাঁরা দেন নি?"

উত্তেজিত কণ্ঠে উমাপতি বাবু বলিলেন, "তবে আর বলছি কি? আমি সদয় ব্যবহার করতে চাচ্ছিলুম, ওরা ওদের ব্যবহার দিয়ে আমার অন্তরের দয়াকে শুষে নিয়েছে।"

মৃদুকণ্ঠে ইলা বলিতে গেল, "কিন্তু বাবা—

উমাপতি বাবু সবেগে বলিলেন, "এতে আর কিন্তু নয় ইলা, আমি তাকে অল্পে ছাড়ব তাই ভেবেছিস কি? যে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর

প্রতি কর্ত্তব্য অটুট রাখতে পারলে না সে কি মানুষ? তোর জীবনটা সে কতখানি ব্যর্থ করে দিয়েছে তা তুই এখনও বুঝতে পারিস নি, আমি তো বুঝেছি। আমি তাকে আদরে মানুষ করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলুম, ভুল করেছিলুম, এবার বেদনা দিয়ে তাকে স্ববশে আনব দেখে নিস। তাকে বুঝিয়ে দেব তাঁতে আমাতে পার্থক্য অনেকখানি, অনেক কষ্টে তাকে আমার নাগাল পেতে হবে। আমি তাকে যে-আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলুম, সে তা অগ্রাহ্য করে আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল, তাকে জানাব যে-আসন তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা কতখানি সাধনায় মেলে। মা আমার, যে ভুল আমি করেছি সে ভুল আমিই সুধরে দেব, তোর ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সুন্দর হয় তারই চেষ্টা করব। যা মা তোর নিজের পড়া কর গিয়ে, অনর্থক আর আমার কাছে তোকে দাঁড়াতে হবে না।"

ইলা যে কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল তাহা তাহার বলা হইল না, বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া উমাপতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বলবার আছে কি ইলা?"

ইলার মুখে কথাটা আসিয়া আটকাইয়া গেল, সে নতমুখে বলিল, "না বাবা।"

ধীরে ধীরে সে সরিয়া পড়িল।

মোক্ষদা যখন তাহার আহার্য্য লইয়া আসিলেন তখন ইলা শুষ্কমুখে বলিল তুমি কবে দেশে যাবে মোক্ষদা মাসী?"

মোক্ষদা বলিলেন, "যে দিন বলবে।"

ইলা বলিল, “তবে কালই চলে যাও, যে কদিন তুমি না আসবে মেনকা দি রাঁধবে। বাবা সেখানে যাওয়ার আগেই তোমার গিয়ে পৌঁছানো চাই, বাবা যাওয়ার পরে গেলে গোলমাল বাধতে পারে।”

মোক্ষদা ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেলেন।

পরদিন সকালে দেশে যাইবার প্রার্থনা জানাইতেই শোভনা চটিয়া উঠিলেন,—রোজ তোমার দেশে যাওয়ার কি দরকার গা বামুন ঠাকরুণ? দেশে তো শুনতে পাই তোমার আপনার বলতে কেউ নেই, তবে এত দেশে যাওয়া কেন?”

চটিয়া উঠিলেও মোক্ষদার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে হইল কেননা মোক্ষদা একেবারে নাছোড় বান্দা, কাঁদিয়া কাটিয়া তিনি শোভনার মত করিয়া লইলেন।

বিদায়ের পূর্ব্বে ইলা গোপনে একতাড়া নোট তাঁহার হাতে দিল, চাপাস্বরে বলিল, “প্রতিজ্ঞা মনে থাকে যেন। আমার নাম করো না, তা হলে তিনি টাকা নেবেন না, তুমি বলো তোমার বেতন হতে এ টাকা দিচ্ছো।”

মোক্ষদা সন্তর্পণে নোটগুলি লুকাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন, “সে আর আমায় বলতে হবে না মা, আমি তোমার নাম মোটেই মুখে আনব না।”

মোক্ষদা রওনা হইলেন, রাত্রের ট্রেণে উমাপতি বাবু চলিয়া গেলেন, গৌরীবাবুর উপর কলিকাতার বাটীর ভার রহিল।

মনের মধ্যে দারুণ উৎকণ্ঠা লইয়া ইলা মোক্ষদার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সম্মুখে তাহার একজামিন আসিতেছিল, বই লইয়া সে পড়িতে

বসিত বটে—মনটা যে কোথায় থাকিত তাহা সেই জানে। শোভনা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ছিলেন, মেয়ে একজামিনের পড়া তৈয়ারী করিতেছে।

প্রতিশ্রুতি মত তৃতীয় দিবসে মোক্ষদা ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার অন্ধকার মুখখানার পানে তাকাইয়া ইলা ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিল। সে মোক্ষদাকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "কি হল ?"

মোক্ষদা গোপন স্থান হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া নির্ব্বাকে তাহার হাতে দিলেন।

বিবর্ণমুখে ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নাম করেছিলে ?"

মোক্ষদা মাথা নাড়িলেন।

উৎকণ্ঠায় ইলার বুকটা ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, "তোমার টাকা জেনেও তিনি নিলেন না ?"

মলিন হাসিয়া মোক্ষদা বলিলেন, "পাগলি এ কথা কি লুকিয়ে রাখা যায় ? আমার বেতন মাত্র পাঁচ টাকা, তাও আমার একবছরের বেতন মাত্র জমা আছে, সে কি তা জানে না ? ষাট টাকার যায়গায় পাঁচশো টাকা দেখেই সে বুঝতে পারলে, একটু হেসে নোট সব আমার হাতে ফিরিয়ে দিলে। এত বললুম—শেষে বললুম না হয় ধার হিসেবে নিয়ে আগে ভিটে বাঁচাও—সে কথা সে মোটে কানেই নিলে না।"

স্পন্দিত বক্ষে ইলা বলিল, "তিনি কি বললেন ?"

মোক্ষদা বলিলেন, "সে হাত দুখানা জোড় করে বললে, আমায় মাপ কর মাসী মা, আমি বুঝেছি ইলা টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে। চিরকাল যার

ঘৃণাই কুড়িয়ে এসেছি আজ যে সে কেন হঠাৎ এমন সদয়া হল তা বুঝতে পারছি নে। যার বাপ আমায় জব্দ করবার জন্যেই বাকি খাজনার দায়ে আমার উপর অত্যাচার করতে এসেছেন, তার দয়ার দানে আমি নিজেকে রক্ষা করতে চাইনে। এ টাকা তাকে ফিরিয়ে দাও গিয়ে, তার কাপড় জামা জুতোর খরচে লাগবে।"

নোটের তাড়া হাতে লইয়া ইলা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সত্য কথাই সে বলিয়াছে, অত্যন্ত বিলাসিনী ইলা, তাহার জামা জুতা কাপড়ে এমন কত টাকা উড়িয়া যায় তাহা যতীন জানে। দরিদ্র সে, দরিদ্রতার অভিমান তাহার মনে দীপ্যমান, ধনীর চেয়ে সে গৌরব অনুভব করে।

ধীরে ধীরে তাহার বড় বড় চোখ দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। হাঁ, দরিদ্রের পার্শ্বে বিলাসিনী পত্নী সাজে না, যে যেমন সে তেমনই জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী চাহিয়া বেড়ায়। সে এখন যথার্থ স্ত্রী হইতে পারিবে যদি সে এই ধনী গৃহের মায়া—বিলাস ত্যাগ করিয়া দরিদ্র নিগৃহীত স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায়। মিলনের ক্ষেত্র যে চাহিয়া ফিরিয়াছে, এ জন্মে ধনীকন্যার সহিত দরিদ্রপুত্রের মিলন তো সম্ভব নয়। সে পুরুষ, সকল রকমে শ্রেষ্ঠতা তাহারই থাকা দরকার। ভগবান সকল দিক তাহার পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু একটা দিক তাহার শূন্যতায় ভরিয়াছেন, তাহার অপরাধ সে দরিদ্রের ঘরে জন্ম লইয়াছে, তাহার অপরাধ সে বড় লোকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে। সে তাহার এই একটা শূন্যতায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাই সে জীবন সংগ্রামে জয়লাভে অশক্ত। সে নিজে ইলার কাছে আসিতে পারিবে না কিন্তু ইলা তো যাইতে পারিবে।

তাহার স্বামীর সহিত মিলন হইবে সেইখানে—সেই পর্ণকুটীরে—অনাটনের মাঝে। স্বামীর পার্শ্বে সেইখানে সে সত্যই স্ত্রীরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিবে, স্বামীর হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়ের প্রতিদান সেইখানে সে করিতে পারিবে।

অজ্ঞাতেই কখন তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল, সে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইল—সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, স্বামীর সুখদুঃখের সমভাগিণী।

পিতা যদি খাজনার দায়ে কুটীরখানি গ্রহণ করেন, সে স্বামীসহ গাছ তলায় থাকিবে। আগে এমন একদিন ছিল—যখন সে কুটীরে যাইবার নাম কেহ করিলে সে জ্বলিয়া উঠিত, আজ সেই কুটীরে বাস করার কল্পনাও বড় মনোরম বোধ হইল।

ত্রিতলের বারাণ্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া শোভনা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তোর ইস্কুলের গাড়ী এসেছে যে ইলা, তোর কাপড় পরা হয়নি এখনও ?"

ইলা সে দিন ভাল করিয়া কাপড় পরারও অবকাশ পাইল না, তাড়াতাড়ি বই কয়খানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

---

(২৩)

বাকি খাজনার দায়ে জমিদার বাবু নালিশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও চাঁপ দিয়াছিলেন—যতীনের নিকট তিনি কয়েক শত টাকা পাইবেন, সে দিতে চায় না। আদালত হইতে সমন আসিল, যতীন হাজির হইল না। দিন সাতেকের মধ্যে পেয়াদা আসিয়া জানাইয়া গেল আর তিন দিন মাত্র মাঝে আছে ইহার মধ্যে সব টাকা না চুকাইয়া দিতে পারিলে স্থাবর অস্থাবর জিনিস তো যাইবেই তাহা ছাড়া যতীনকে জেলেও যাইতে হইবে।

মেধার পিতা তাহার কয়েকদিন আগে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি উইল করিয়া যান নাই, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া বাড়ী ঘর দখল করিয়া লইয়া বসিল। নিজের বাড়ীতে পরের মত হইয়া থাকা, পরের উপর আত্ম-নির্ভর করা তেজস্বিনী মেধা সহিতে পারিল না, সে একদিন ঝগড়া করিয়া সাবিত্রীর নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, সাবিত্রী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল।

যতীনের শুষ্কমুখ দেখিয়া মেধা বলিল, "এখনও চুপ করে বসে ভাবছ ছোড় দা, টাকা যোগাড় করবার কোনও উপায় দেখলে না, সত্যিই কি জেলে যাওয়া তোমার ইচ্ছে? এই বাড়ীখানা গেলে বউদিই বা যাবেন

কোথায়, আমিও যে তোমাদের বাড়ী এসে পড়েছি, আমিই বা কোথায় দাঁড়াব ?”

যতীন জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, “বউদির দাদাকে পত্র দিয়েছি যেন তিনি পত্র পাঠ এসে বউদিকে নিয়ে যান। আর তুমি,—তোমার উপায় আমি কি করব মেধা, তুমি না হয় বউদির সঙ্গেই যেয়ো। আমাদের এখন শনির দশা মেধা, আমাদের সংস্পর্শে এসেই তোমার দুর্দ্দশা ঘটেছে।”

সাবিত্রী বলিল, “সত্যিই সে কথা ঠাকুর পো, ওর বিষয় সম্পত্তি যে দখল করেছে, সে একটা জঘন্য অপবাদের সৃষ্টি করেছে তা শুনেছ বোধ হয় ?”

শান্ত হাসিয়া যতীন বলিল, “তা শুনেছি বই কি। তুই অত ভেঙ্গে পড়েছিস কেন মেধা, লোকে মিথ্যে করে তোর আমার নামে যত খুসি কলঙ্ক দিক, ভগবান তো জানছেন আমরা ভাই বোনের মতই পরস্পরকে ভালবাসি। আমি আজও তোকে সেই ছোট্ট মেধা বলেই জানিরে, তুই যে বড় হয়েছিস সে কথা আমার মনেও পড়ে না। তুই মনে প্রাণে নির্দ্দোষ, তোর ভয় কি মেধা ? আজ সবাই জানছে আমি জমিদার হতে পারব না, জমিদার আমায় ত্যাগ করেছেন, আমার উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন তাই ওরাও আমার শত্রু হয়েছে। সত্যকে ধরে পড়ে থাক মেধা, মিথ্যের আবরণ একদিন খসে পড়বেই এ জেনে রাখিস।”

মেধা একেবারে তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, “যদি তোমার মত অন্তরে জোর আমার থাকত

ছোড়দা, তা হলে আমি যে এতটুকুও ভাবতুম না। আমার সব ওরা নিয়ে সুখী হোক ছোড়দা, আমার সুনামটুকু ঘুচিয়ে ওরা কি সুখ পেলে, এতে ওদের কি লাভ হলো ছোড়দা?"

যতীন একটু হাসিয়া বলিল, "লাভ দেখে কি ওরা কাজ করছে মেধা? তুমি জানছ এতে ওদের কোন লাভ নেই, ওদের সময় কাটানোর জন্যে এমন একটা কথা লাভ বই কি? তুমি জানো না মেধা, এর মূলে রয়েছে নরেন, সে ছোটবেলা হতে আমার প্রতিপক্ষ। এতকাল ভাবি জমিদার বলে আমার বিপক্ষে কিছু বলতে পারে নি, এখন সে জমিদারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রতিনিয়ত আমি যে ধাক্কা সচ্ছি, আমি যত কথা শুনছি, যদি তার অর্দ্ধেকও তোমাদের সইতে বা শুনতে হতো মেধা, তা হলে আর তোমার অস্তিত্ব জাগিয়ে রাখবার ইচ্ছা হতো না, তোমার মনে হতোযেন তুমি মাটি হয়েই মাটির সঙ্গে মিশে যাও।"

উঠিয়া বসিয়া অসংযত চুলগুলাকে দুই হাতে জড়াইতে জড়াইতে মেধা ভাঙ্গাস্বরে বলিল, "একটা কাজ করবে ছোড়দা?"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল' "কি কাজ মেধা?"

মেধা স্খলিতপদে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল, একটু পরেই তাহার গহনার ছোট বাক্সটা আনিয়া যতীনের সামনে খুলিয়া দিয়া বলিল, "দেখ, এতে অনেক গয়না আছে, বাবা আমাকে বিয়ের সময় এসব দিয়েছিলেন। তুমি এ গুলো বিক্রি করে ফেল, এতে যা টাকা উঠবে তাতে অনায়াসে তোমার সব দেনা শোধ হয়ে যাবে।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া যতীন বলিল, "দূর তা কি হয় মেধা? তোর সময় অসময় আছে, গয়নাগুলো রাখলে কত সময় কত উপকার দেবে।

আমি বিধবার জিনিস নেব না মেধা, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে ; ভেসেছি যখন তখন ভেসেই যাব, আমি তীরে আসতে চাইনে। আমি শেষ পর্য্যন্ত দেখব মেধা, ভগবানের বিচার আছে কি-না তা দেখব, সহজেই ছেড়ে দেব না।"

মেধা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল,—"নেবে না ছোড় দা—কেন নেবে না? বোন যদি ভাইয়ের দরকারের সময় নিজের জিনিস দিতে চায় ভাই কি তা ফিরিয়ে দেয়?"

যতীন সস্নেহে মেধার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "তুই কাঁদছিস কেন মেধা? এখন থাক, যদি বিশেষ দরকার পড়ে কাল দিস—কাল নেব।"

বিশেষ দরকার পড়া সত্ত্বেও কাল আসিয়া গত হইয়া গেল, আবার কাল আসিল, যতীন মেধার অলঙ্কারে হাত দিল না।

সাবিত্রীর দাদা পত্র দিলেন—তিনি শীঘ্রই গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। রবীন কলিকাতায় সস্ত্রীক ফিরিয়াছে, বর্ম্মায় এক দরিদ্র বাঙ্গালীকে সে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছে, সেই মেয়েটীই এখন তাহার স্ত্রী। বোধ হয় শীঘ্রই সে সাবিত্রীকে সব কথা বলিবার জন্য ওখানে যাইবে। সাবিত্রীর কি করা কর্ত্তব্য তাহা যেন সে এই বেলাই ঠিক করিয়া লয়।

যতীন পত্রখানা বউদির পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমার দাদার পত্রখানা পড়ে দেখ বউদি। দাদা বোধ হয় এবার অনেক টাকার মালিক হয়ে দেশে ফিরেছেন তাই তোমার দাদার সঙ্গে আবার সম্প্রীতি হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে তোমার দাদার ইচ্ছে তুমি স্বামীর কাছেই যাও।"

সাবিত্রী পত্রখানা পড়িয়া মৃদু হাসিল,—"আমার জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না ভাই, আমার উপায় আমিই ঠিক করে নেব। তোমার দাদা যে আমায় গ্রহণ করতে চান এ আমার সৌভাগ্য, আর আমার দাদা যে আমার মত জানতে চাচ্ছেন এও সৌভাগ্য বলতে হবে।"

যতীন উৎসাহের সঙ্গে বলিল, "তা হলে প্রস্তুত হয়ে নাও বউদি, আমি কাল সকালের ট্রেণেই কারও সঙ্গে তোমায় কোন্নগরে পাঠিয়ে দেই, দাদা সেখান হতে তোমায় নিয়ে যাবেন, এখানে এতদূরে তাঁকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না।"

সাবিত্রী বলিল, "সে কথা ঠিক, তারপর তুমি—?"

যতীন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সত্যি, আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে যেতে পারব বউদি, নইলে এখান হতে দু পা যেতে যেতে আমার মনে হবে পেছনে তোমাদের ফেলে এসেছি, জমিদারের পেয়াদা পাইকগুলো হয় তো তোমাদের হাত ধরে বার করে দিয়েছে—হয় তো—হয় তো কত অত্যাচারও করছে। তোমাদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতেও পারব বউদি, তুমি দয়া করে শুধু চলে যাও। মেধাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, নইলে দুনিয়ায় ওকে বিনাস্বার্থে কেউ স্থান দেবে না। আমায় যথার্থ মুক্তির আনন্দ প্রাণভরে একবার অনুভব করতে দাও বউদি, আমি আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলি।"

মুখখানা অত্যন্ত কঠিন করিয়াই সাবিত্রী বলিল, "আমার জন্যে তোমায় এতটুকু ভাবতে হবে না ঠাকুরপো। তুমিও যেমন শেষ পর্য্যন্ত দেখবে বলছ আমিও তেমনি শেষ পর্য্যন্ত দেখব। ভয় নেই, জগতে এমন কেউ নেই যে আমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে। যখন তোমায়

ধরে নিয়ে তারা চলবে, আমরাও তাদের পেছনে পেছনে চলব। আমি স্বামীর কাছেও যাব না, ভাইয়ের বাড়ীও যাব না, যারা একদিন আমায় অবহেলা করে গেছে, তাদের দুয়ারে দুটি অন্নের জন্যে কেন যাব ঠাকুরপো? ভগবান সাহস দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, তার উপযুক্ত ব্যবহার করব। যখন জেল হতে ফিরবে, তোমার বউদিকে সৎকাজে নিযুক্তা দেখতে পাবে, মেধাকেও সেখানে পাবে।"

উৎফুল্লমুখে যতীন বলিল, "সে আমি জানি বউদি। মূঢ় কাণ্ডজ্ঞানহীন দাদার 'পরে আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই, দাদা নিজের ব্যবহারে আমার ভক্তিশ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। আমি নারীত্বের মর্য্যাদা বুঝি বউদি, সেই জন্যেই তোমায় দাদার কাছে যেতে দিতে প্রকৃত মত আমার নেই। সত্যিই ভগবান তোমায় সাহস দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, তুমি তার সদ্ব্যবহার কর। এতকাল নিজের মর্য্যাদাকে অটুটভাবে রেখেছ, জীবনের বাকি কয়টা দিনও যে এমনিভাবে পবিত্র হয়ে কাটাতে পারবে, সে আমি জানি। বউদি, সত্যি যেন আমি জেল হতে বেরিয়ে এসে তোমায় আদর্শ নারীমূর্ত্তিতেই দেখতে পাই, তোমার মধ্যে মায়ের বিকাশ পূর্ণভাবে দেখতে পাই।"

সাবিত্রীর দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল, সে তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে চলিয়া গেল।

আদালতের পেয়াদা—কাছারীর পেয়াদা, ম্যানেজার, গোমস্তা প্রভৃতি সকলে আসিয়া বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল, ইহাদের মধ্যে যতীনের চিরশত্রু নরেন্দ্রনাথ ওরফে নরুও ছিল।

শান্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়া যতীন বলিল, "আমায় তোমরা সদরে নিয়ে যেতে চাও—চল, আমি এখনই যেতে রাজি আছি। বাড়ীর মেয়েরাও বেরিয়ে আসছে, উৎপীড়ন করতে হবে না। একটা কথা,—আমি একবার তোমাদের জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই, দেখা হবে কি?"

নিশিগাঙ্গুলী সবিনয়ে জানাইলেন—জমিদার মহাশয় আজ প্রাতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মিহিরপুর গ্রামে বিশেষ আবশ্যকে গিয়াছেন।

যতীন অধর দংশন করিল, বুঝিল উমাপতি বাবু বাড়ীতেই আছেন, মিহিরপুর যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহার সহিত দেখা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনি সে মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল, শান্ত হাসিয়া বলিল, "ভাল কথা। তাঁকে বলবেন, তিনি উপযুক্ত কাজই করেছেন, আমি এ জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

পিছন ফিরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বউদি, মেধাকে নিয়ে বেরিয়ে এসো, এ বাড়ীর সঙ্গে আর আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।"

নিশি গাঙ্গুলী সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "আমার দোষ নেই যতীন বাবু, আমি চাকর মাত্র।"

যতীন বলিল, "সে কথা জানি গাঙ্গুলী মশাই। দোষ কারও নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের, নইলে মা কেন স্বেচ্ছায় সন্তান দান করেছিলেন? কুকুরের মত সেখানে পড়ে থাকতুম, আত্মবোধ জ্ঞান ছিল না, এ জ্ঞানই বা কল্যাণী দিদি আমার মনে জাগিয়ে দিলেন কেন? সবই আমার দোষ গাঙ্গুলী মশাই, দোষ আর কারও নেই।"

"কে বললে দোষ তোমার? দোষ তোমার নয়, দোষ আমার,—"

ইলা যখন পিছন হইতে সরিয়া আসিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন সসম্ভ্রমে সকলেই সরিয়া গেল।

তাহার মুখখানা তখন অস্বাভাবিক দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠস্বরও তেমনি উগ্র। যতীন তাহার সে দীপ্ত মুখের পানে চাহিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল,"তুমি এখানে কি করতে এসেছ ইলা?"

দীপ্তকণ্ঠে ইলা বলিল, "এসেছি আমার কর্ত্তব্য পালন করতে। গাঙ্গুলী কাকা, এদিকে আস্থন, আপনার কাছে আমার দরকার আছে।"

ইলাকে দেখিয়াই নিশি গাঙ্গুলী পিছনে হটিতেছিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন ইলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া বরাবর এখানে চলিয়া আসিয়াছে। কর্ত্তাবাবু বাড়ীতে আছেন, এ খবরটা তাঁহাকে এখনই দেওয়া দরকার।

ইলার আহ্বানে কম্পিত বক্ষে কম্পিতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন, একটু হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "বাড়ী গিয়েছিলে কি মা?"

ইলা বলিল, "না বাড়ী যাওয়ার জন্যে আমি এখানে আসিনি কাকা, এই বাড়ী রক্ষা করে এই বাড়ীতেই বাস করতে এসেছি। বলুন বাকি খাজনা কত, আমি এখনি তা চুকিয়ে দিতে চাই।"

নিশি গাঙ্গুলী কম্পিতকণ্ঠে কি বলিলেন বুঝা গেল না। ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া ইলা বলিল, "আদালতের কাগজ দিন, কত হয়েছে দেখে মিটিয়ে দিচ্ছি।"

নিশি গাঙ্গুলীর হাত হইতে কাগজখানা সে টানিয়া লইল, একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া সে তাহার হাতের ছোট ব্যাগটা খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া নিশি গাঙ্গুলীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া সগর্ব্বে বলিল, "এই নিন খাজনার টাকা, যান—আমার বাবাকে দিন গিয়ে। আর যে টাকার জন্যে বাবা নালিশ করেছেন যদিও তা সম্পূর্ণ মিথ্যে—তবু বাবাকে জানাবেন আজ এতক্ষণ তা আদালতে দাখিল হয়ে গেছে, এই দেখুন তার রসিদ। বাবা যদি দেখতে চান পাঠিয়ে দেবেন। না দেখতে চাইলেও আজই সন্ধ্যের মধ্যে সদর হতে সে খবর তাঁর কাছে আসবে; যান, আর এখানে আপনাদের কোন দরকার নেই।"

হতভম্বপ্রায় নিশি গাঙ্গুলী নোটের তাড়া হাতে লইয়া এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইলেন। জমিদারের বরকন্দাজ পেয়াদাগুলি মনিব কন্যাকে সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়া গেল, আদালতের পেয়াদা আমিন সরিয়া পড়িলেন, গ্রামের নিষ্কর্ম্মাগুলি তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ইলা রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা এখানে কি মজা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ? যাও, এখানে কোনও ব্যাপার ঘটবে না যা দেখে তোমরা অন্তরে অতুল আনন্দ উপভোগ করবে।"

অপ্রস্তুত লোকগুলি তখনই সরিয়া গেল।

যতীন চোখ তুলিয়া ইলার পানে তাকাইতে পারে নাই, মাটীর পানে তাকাইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়াছিল।

অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে ইলা বলিল, "ছি ছি, স্বেচ্ছায় অপমানিত হওয়া একেই বলে। আমি মোক্ষদার হাতে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তা ফিরিয়ে দিলে কেন? এই যে ওরা তোমায় ধরে নিয়ে যেত, সেইটেই কি বড় ভাল হতো?"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, চোখ দুইটী জলভারে আনত হইয়া পড়িল।

যতীন এবার চোখ তুলিল, স্থির দৃষ্টি ইলার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ধীরস্বরে বলিল, "সত্যি ইলা, তোমার টাকা আমি নিতে পারিনি, আমার মনে হচ্ছিল সেও তোমাদের একটা পরীক্ষা, তোমরা সবাই মিলে আমায় বিপদে ফেলে আবার দেখছিলে বিপদ ত্রাণের জন্যে তোমাদেরই টাকা নেই কি না? এখন দেখছি—"

ভাঙ্গাস্বরে ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "থামলে কেন? বল এখন কি দেখছ?"

যতীন বলিল, "দেখছি আমাদের মধ্যে প্রচুর দূরত্ব যে ছিল, অজ্ঞাত হাতের আঘাতে সে দূরত্ব ঘুচে গেছে, তুমি ঘৃণা ত্যাগ করে আমার কাছে এসেছ।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইলা বলিল, "ওগো, সে জন্যে আমায় ক্ষমা করো, তোমায় মানুষ করে তুলবার জন্যেই আমি বাহ্যিক তোমায় ঘৃণাই করেছি। এক একদিন বড় নিদারুণ আঘাত তোমায় দিয়েছি, জেনেছি সে আঘাতে তোমার বুক ভেঙ্গে গেছে, তবুও আঘাত করেছি, যদি

তোমার আত্ম-মর্য্যাদা বোধ হয় সেইজন্যে। আমি তোমায় আঘাত দিয়ে জানাতে চেয়েছি বড় লোকের বাড়ীর অন্নদাস হয়ে থাকার চেয়ে—সচ্ছন্দে সেই ভাত খেয়ে বাবুগিরি করে বেড়ানোর চেয়ে নিজের ঘরে থেকে মুটের কাজ করেও খাওয়া ভাল। তুমি আমায় চেননি তাই তুমি আমার—"

বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত আবেগে সে কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে যতীন বলিল, "কেঁদ না ইলা, সত্যিই আমি মস্ত বড় ভুল করেছিলুম, তোমার 'পরে অন্যায় দোষারোপ করেছিলুম, আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু তুমি এখানে এমন সময়ে কি করে এলে ইলা আমি তাই ভাবছি।"

ইলা চোখ মুছিয়া বলিল, "আমি জানি আজ এই কাণ্ড ঘটবে। কালই আমি আসতে চেয়েছিলুম মার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আমার খুব ঝগড়াও হয়ে গেছে। ওখানকার গার্জ্জেন গৌরীবাবু আমায় বাধা দিতে এসেছিলেন, বাবার অমতে গেলে তিনি যে আমায় ত্যাগ করবেন সে ভয়ও দেখিয়েছিলেন, আমি কোন কথা কানে নেই নি। উঃ, খুব সময়েই এসে পড়েছি, বিকেলে এলে কাউকেই দেখতে পেতুম না।"

মলিন হাসিয়া যতীন বলিল, "কিন্তু কাজটা তো ভাল করলে না ইলা, তোমার বাবা তোমায় এর জন্যে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।"

সগর্ব্বে ইলা বলিল, "আমিও ক্ষমার প্রত্যাশী হয়ে যাব না। এ রকম জায়গায় ক্ষমার প্রত্যাশী হওয়া নিতান্ত অন্যায়। বাবা ধনগর্ব্বে মত্ত হয়ে কিছু না বুঝতেও পারেন, আমি তো সব বুঝি। আমি বাবার কাছে আর যাব না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

যতীন শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আবাল্যসুখে প্রতিপালিতা তুমি, এই ভাঙ্গা

ঘরে সামান্য শাকভাত খেয়ে কি থাকতে পারবে? তুমি তো জানো তোমার হতভাগ্য দীন-দরিদ্র স্বামীর কিছু নেই, কোনক্রমে মোটা ভাত মোটা কাপড় সে ভবিষ্যতে সংগ্রহ করতে পারবে মাত্র।"

রুদ্ধকণ্ঠে ইলা বলিল, "আমিও তাই চাই গো, আমি তোমার পাশে এই ভাঙ্গা ঘরেই থাকতে চাই, তোমার প্রসাদ সেই মোটা ভাত শাকই চাই। তোমার পায়ে পড়ি—আমায় তুমি ধনীর মেয়ে বলে আর ভেবো না, তোমারই মত গরীব আমি তাই ভাবো। গরীবের স্ত্রী গরীবই হয়ে থাকে, সে বিলাসিনী ধনীর মেয়ে হয়ে সুখে থাকতে চায় না।"

গদগদ কণ্ঠে যতীন বলিল, "আজ আমাদের সত্যিই মিলন হলো ইলা, আজ হতে আমাদের মাঝখানে আর এতটুকু ব্যবধান জেগে রইল না। বাড়ীর ভেতর চল, বউদিকে প্রণাম করবে।"

মেধা দুই হাত মুখের উপর চাপা দিয়া বারাণ্ডায় দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল, সাবিত্রী একবার জন্মের মত পুরাতন গৃহ দেখিতে গিয়া মেঝের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছিল।

"মেধা, তোর ছোট বউদি এসেছে রে, বউদি কই?"

মেধা চমকাইয়া ধড়ফড় করিয়া দাঁড়াইল, ইলার পানে তাকাইয়া সে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না।

ইলা তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার কথা আগেই সব শুনেছি ভাই, তুমি আমার অপরিচিতা নও। তোমার কাছে আমি চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে আছি, তোমার ঋণ শুধতে কখনই পারব না। দিদি কোথায়, আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল।"

চপলা মুখরা মেধা একটা কথাও বলিতে পারিতেছিল না, ইলার আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দিদি ঘরে।"

যতীন হাসিয়া বলিল, "তোর ছোট বউদিকে প্রণাম করলি নে মেধা, এই বুঝি তোর জ্ঞান হয়েছে ?"

মেধা তাড়াতাড়ি নত হইতেই ইলা তাহাকে বাধা দিল, "না না, থাক, আমায় আর প্রণাম করতে হবে না, তোমার ছোড়দার কথা শোন কেন ?"

সাবিত্রী মুহ্যমান ভাবে পড়িয়া ছিল, তাহার পায়ের উপর একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া ইলা ডাকিল, "দিদি—"

মেধা ভাঙ্গাস্বরে বলিল, "ছোট বউদি এসেছেন বউদি, সব খাজনা মিটিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, আমাদের আর এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে না। ছোড়দা বললেন।"

সাবিত্রী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, একবার ইলার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

"আমি তোমার কাছে থাকতে এসেছি দিদি, তোমার ছোটবোনকে তোমার পাশে জায়গা দাও।"

"ছোট বউ——"

দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার স্কন্ধের উপর মুখখানা রাখিয়া সাবিত্রী ক্ষুদ্র বালিকার মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ইলার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

———

(২৫)

রবীন যখন অনেক কাল পরে ফিরিয়া আসিল তখন সে প্রচুর অর্থের অধিপতি। কলিকাতায় সে সাবিত্রীর ভ্রাতা শরতের সহিত ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল, লাভও হইতেছিল বেশ।

রবীনের সঙ্গে শরতও আসিয়াছিল, সে সাবিত্রীকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী মাথা নাড়িল।

বিস্মিত শরৎ বলিল, "যাবিনে কেন সাবিত্রী তার কারণটা আগে বল। রবীন তোকে নিয়ে যেতে এসেছে, যতীনকে সে নিজের ব্যবসার কাজ দেবে, সকলকেই সে ওখানে নিজের বাসায় রাখতে চায়। যদিও তার স্ত্রী আছে সাবিত্রী, তবু সে তোকেই গৃহিণী করে রাখতে চায়।"

সাবিত্রী শুষ্কমুখে বলিল, "আর তা হয় না দাদা।"

শরৎ বলিল, "কেন হয় না?"

সাবিত্রী বলিল, "সে কথা আমি তাঁকেই জানাব।"

বহুকাল পরে সেদিন স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল।

আজ সাবিত্রীর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না, সে গলায় কাপড় জড়াইয়া নত হইয়া স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

রবীন আজ বিশ্বের সৌন্দর্য্য স্ত্রীর সেই শ্যামমুখে দেখিতে পাইল, গদগদ কণ্ঠে সে ডাকিল, "সাবিত্রী—"

সে দুই পা অগ্রসর হইতেই সাবিত্রী পিছাইয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমায় দূর হতে ডাকবার অধিকারই তোমার আছে প্রভু, একটা রাত্রের দুইটা মন্ত্রোচ্চারণের ফলে সেই অধিকারই পেয়েছ, অঙ্গস্পর্শ করবার অধিকার তোমার নেই। চিরকাল আমায় দূরে রেখে এসেছ, বাকি যে কয়টা দিন আছে কাছে ডেকো না, এমনি দূরেই থেকো।"

বিস্মিত রবীন বলিল, "কেন সাবিত্রী, আমি যে তোমায় স্ত্রীরূপে বরণ করে নিয়ে যেতে এসেছি।"

বিকৃত হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "আর সেদিন নেই, যেদিন আমি এমনি একটা ডাকের অপেক্ষা করেছিলুম—সেদিন চলে গেছে। এখন আমি তোমার কাছ হতে অনেক দূরেই সরে থাকতে চাই, আমি তোমায় কাছে পেতে চাইনে। আমার এ অবাধ্যতার জন্যে মাপ করো, আমায় অপরাধী করো না। তুমি আর সকলকে কলকাতায় তোমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাও যাও, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া রবীন বলিল, "বুঝেছি, তুমি আমার 'পরে রাগ করেছ তাই সেখানে যেতে চাও না। তোমার ইচ্ছা যদি না হয় সাবিত্রী—আমি তোমায় কাছে পেতে চাইব না, আমার দ্বারা তোমার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হবে না। সকলেই এখান হতে যাবে, তুমি একা এখানে থাকতে পারবে না তো সাবিত্রী!"

সাবিত্রী হাসিল, "বেশ থাকতে পারব, তাতে আমার এতটুকু ভয় হবে না। আমি তোমার 'পরে রাগ করিনি, কারণ তুমি আমায় কিছু দিয়ে তো বঞ্চিত করনি, তুমি আমায় কখনও কিছু দাওনি, তাই পেয়ে হারাণোর ব্যথা আমার মনে কোন দিনই বাজেনি। তোমার কাছে

বরং আমিই অনেক দোষ করেছি, আমার সে সব অপরাধ ক্ষমা করো।”

সে কিছুতেই এ ভিটা হইতে নড়িল না, ইলাও নড়িতে চাহিল না, যতীনও বউদিকে একা রাখিয়া স্ত্রীকে লইয়া যাইতে চাহিল না। মেধা ও ইলাকে লইয়া সাবিত্রী গ্রামেই রহিয়া গেল, রবীন যতীনকে লইয়া চলিয়া গেল।

উমাপতি বাবুর ক্রোধ কিছুদিন খুব বেশী রকমই ছিল, শোভনা এক-মাত্র কন্যাহারা হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিলেন। তাঁহার অহঙ্কার দূর হইয়া গিয়াছিল। কন্যাকে কাছে পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

উমাপতি বাবুর ক্রোধ দুই বৎসর যাইতেই উড়িয়া গেল। যেদিন সাবিত্রী নবজাত খোকার আগমন-বার্ত্তা তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইল, তিনি সেই দিনই সস্ত্রীক গ্রামে পদার্পণ করিলেন।

“কইরে, আমার দাদু কই ইলা?”

তিনি প্রবেশ করিতেই মেধা তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় আসন পাতিয়া দিল। লজ্জায় আরক্তমুখী ইলা গৃহমধ্যে লুকাইয়াছিল, সাবিত্রী হাসিমুখে শিশুকে আনিয়া শোভনার কোলে দিল।

শিশুর মুখে স্নেহচুম্বন দিয়া স্বামীর কোলে তাহাকে দিতে দিতে শোভনা বলিলেন, “দেখ গো, দুষ্টু ছেলে দেখিতে ঠিক যতীনের মতই হয়েছে।”

গম্ভীরমুখে কর্ত্তা বলিলেন, “বাপের মত গুণও হবে, আত্মমর্য্যাদা বোধটা বেশী রকমই হবে বোঝা যাচ্ছে। হবে না কেন, ওই যে কথাতেই

আছে—বাপকো বেঁটা সিপাইকো ঘোড়া, কুছ নেই জানতে তো—থোড়া থোড়া।"

সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইলা হাসিমুখে পিতার মাথার পাকাচুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকাটা বুঝি ভাল নয় বাবা?"

পিতা বলিলেন, "খুব ভাল মা, তবে সময় সময় সেটা যে মানুষের মনে বিরক্তি—রাগ জন্মিয়ে দেয়, এটাও বোধ হয় জানো।"

ইলা সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিল, "বাবার মাথার চুল এই দুই বছরেই সব পেকে গেছে।"

উমাপতি বাবু বলিলেন, "মা না থাকলে ছেলের সব রকমেই দুর্দ্দশা হয় তা জানিস বোধ হয়?"

সাবিত্রী বলিল, "বাবা, খোকার অন্নপ্রাশনে সকলকে আনতে হবে, দার্জ্জিলিংয়েও খবর দিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই, আগে তাদের পত্রপাঠ এসে খোকাকে দেখে যেতে বলি। এখানে এলেই কল্যাণী খোকার বাড়ী এসে জুটবে, আর খোকাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।"

ক্ষুদ্র এক মাসের শিশুটীকে তিনি পরমস্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

সমাপ্ত

আমাদের ভাল ভাল কতকগুলি বই—

কাজী নজরুলের—

অগ্নিবীণা—	১৷০
পূবের হাওয়া—	১৷০
চিত্তনামা—	১৲
ঝিঙেফুল—	৸০
সাম্যবাদী—	৵০
জবানবন্দী—	⁄০
রিক্তের বেদন—	১৷৷০
ব্যথার দান—	১৷৷০
দুর্দ্দিনের যাত্রী—	৷৵০
ছায়ানট—	১৷০
দোলন চাঁপা—	১৷০
বাঁধন-হারা—	(যন্ত্রস্থ)

বারীন্দ্রের—

আত্ম-কাহিনী—	১৲
মুক্তির দিশা—	১৲

স্বামী সত্যানন্দের—

মুক্তি সাধনা—	৸০

জোয়ার্দ্দার [illegible]মদার হোসেনের—

বেতাল নূপুর—	৸০

উপাধ্যায়-ব্রহ্মবান্ধব—	১৲

অমরেশ কাঞ্জিলালের—

১। জাতীয়তার অনুভূতি—	৷০
২। কুটীর শিল্প—	৷০
৩। রং ও রঞ্জনবিদ্যা—	৷০
৪। লাভজনক কৃষি—	৷০
৫। মানুষ তৈয়ারীর মসলা—	৷০
৬। ব্যক্তিগত অর্থনীতি—	৷০
ছয়খানা একত্রে—	১৷০
লালা লাজপত রায়—	৷০

ছোট ছেলেদের গল্পের বই—

কর্ণ—	৷৷৵০
লক্ষ্মণ—	৶০
মেবার—	৷০
চিত্তরঞ্জন—	৷৵০
ঝিঙেফুল—	৸০